তথ্যের অধিকার

তথ্য অধিকার আন্দোলন

তথ্যের অধিকার

সম্পাদনা : জাকির হোসেন

জানুয়ারি ২০০৭

তথ্য অধিকার আন্দোলন
(Campaign on Citizens Right to Information)

Management and Resources Development Initiative
64
2/9, Sir Syed Road
(3rd Floor)
Mohammadpur
Dhaka-1207
★ MRDI ★

সম্পাদক	জাকির হোসেন
সম্পাদনা পরিষদ	আহমেদ স্বপন মাহমুদ অমিত রঞ্জন দে সামছুল আরিফিন মোঃ সারওয়ার শাহরিয়ার আমিন আলমগীর কবির
প্রকাশনা সহযোগিতা	নাগরিক উদ্যোগ বাড়ি নং-৮/১৪, ব্লক-বি, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭ ফোন : ৮১১৫৮৬৮, ফ্যাক্স : ৯১৪১৫১১ E-mail : nu@bdmail.net
প্রকাশক	তথ্য অধিকার আন্দোলন (Campaign on Citizens Right to Information)
মূল্য	ষাট টাকা
প্রচ্ছদ	মিঠু আহমেদ
কম্পিউটার	মিজানুর রহমান লায়লা আরজুমান বানু
প্রকাশকাল	জানুয়ারি ২০০৭
মুদ্রণ	উষা আর্ট প্রেস ১২৭/১ লালবাগ রোড, ঢাকা-১২১১।

সূচিপত্র

১. হাম জানেঙ্গে হাম জিয়েঙ্গে ৯
মশিউল আলম
২. অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট বহাল রেখে সংবাদপত্রের
স্বাধীনতা সম্ভব নয় ১৫
মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর
৩. সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও ব্যক্তি মানুষের তথ্য-অধিকার ২১
রোবায়েত ফেরদৌস
৪. নির্বাচনে প্রার্থীদের সম্পর্কে ভোটারদের তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার ২৯
ড. বদিউল আলম মজুমদার
৫. যোগাযোগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে ৩৮
সানজিদা সোবহান
৬. অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট : বাংলাদেশের জনগণ তথ্য প্রাপ্তির
অধিকার থেকে বঞ্চিত ৪০
তছলিমা খাতুন
৭. তথ্যের অধিকার একটি মানবাধিকার ৪৫
জাকির হোসেন
৮. আমাদেরও জানার অধিকার আছে ৪৭
মুহাম্মদ আমিরুল হক, তুহিন, উম্মে ওয়ারা মিশু
নাজমুন নাহার সুমি, উম্মে সরাবন তহুরা, ফারজানা হোসেন তিন্নি
ইয়াসমিন বেগম, তাপস কান্তি বল
৯. তথ্যে প্রবেশাধিকার কেন জরুরী ৫১
আবু নাসের মঞ্জু
১০. নারীর তথ্যের অধিকার ৫৩
সৈয়দা আশরাফিজ জাহারীয়া মিথী
১১. সম্পদ আত্মসাতের ন্যায় তথ্য গোপন করাও দুর্নীতি ৫৮
রফিকুল ইসলাম

১২. তথ্যের অপ্রতুলতা উপকূলীয় এলাকায় ব্যাপক প্রাণহানি এবং
তথ্য অধিকারের প্রাসঙ্গিকতা ৬৩
মাহমুদ হাসান
১৩. সুশাসনের জন্য চাই তথ্যের অবাধ প্রবাহ ৬৭
সাজ্জাদ হুসেইন ও শামীম ইফতেখার
১৪. তথ্য অধিকার আইন অর্থলোলুপ কর্মকর্তাদের মাঝে আতঙ্কের
সৃষ্টি করেছে ৭১
১৫. দক্ষিণ এশীয়ায় তথ্য প্রাপ্তির অধিকার ৭৪
ড. গোলাম রহমান
১৬. তথ্যের অধিকার বনাম ব্যবসায়িক স্বার্থ ৭৮
আহমেদ স্বপন মাহমুদ
১৭. তথ্য অধিকার গণতন্ত্র ও সুশাসনের প্রাণ ৮১
অমিত রঞ্জন দে

সম্পাদকীয়

তথ্য গণতন্ত্রের প্রাণ। তথ্য লাভের অধিকার মানুষের অন্যান্য মৌলিক অধিকারসমূহ নিশ্চিতকরণের জরুরী এক সহায়ক। তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত না থাকায় সুশাসন তথা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ব্যাহত হচ্ছে, মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে, দুর্নীতি লাগামহীনভাবে বেড়ে যাচ্ছে। সরকারি সংস্থা ও বেসরকারি কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ তথ্য গোপন করার মাধ্যমে জনগণের স্বার্থকে প্রতিনিয়ত ক্ষুন্ন করে চলেছে। অথচ গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে এবং জীবনকে মর্যাদাপূর্ণ করতে যা কিছু দরকার একজন নাগরিক হিসেবে তার সবকিছু জানার অধিকার রয়েছে। কিন্তু বর্তমানে দেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে এ বিষয়ে কোন আইন বিদ্যমান নেই বরং এমন কিছু আইন রয়েছে যা এ তথ্য অধিকারকে সংকুচিত করে। ফলে দেশ হিসেবে আমরা পিছিয়ে পড়ছি, সামগ্রিক উন্নয়ন হচ্ছে বাধাগ্রস্ত।

ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসকরা তাদের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার লক্ষ্যে ১৯২৩ সালে অঞ্চলে অফিসিয়াল সিক্রেসি অ্যাক্ট-এর প্রবর্তন করে। পরবর্তী শাসকরা সেটাকে সযত্নে সুরক্ষা করে চলেছে। তথ্যের ভান্ডার তাদের কাছেই কুক্ষিগত আর এই জগদ্দল পাথরের নীচে চাপা পড়ে প্রতিদিন পিষ্ঠ হয়ে চলেছে কোটি কোটি মানুষের স্বার্থ। অথচ দেশ এখন স্বাধীন। স্বাধীন দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণই সকল ক্ষমতার মালিক। সবধরনের তথ্য জানা তাদের মৌলিক অধিকার। রাষ্ট্রও জনগণকে সবধরনের তথ্য জানাতে বাধ্য। কখন, কোথায় কি হচ্ছে, কিভাবে হচ্ছে, কেন হচ্ছে তা যদি জনগণের জানা থাকে তাহলে আমলা-রাজনীতিক-ব্যবসায়ী কেউই দুর্নীতি করতে পারবে না। দেশ ধাবিত হবে সুশাসন প্রতিষ্ঠার দিকে। কিন্তু ক্ষমতাধররা ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার লক্ষ্যে তথ্য গোপন বা অবাধ তথ্য প্রবাহে বাধা সৃষ্টি করে। তারা জনগণের অধিকারকে পদদলিত করে নিজেদের গোষ্ঠীগত, দলীয় এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে এগুলি করে থাকেন।

একটা দেশ কতটা গণতান্ত্রিক তা পরিমাপের অন্যতম মাপকাঠি হল সেখানে তথ্য কতটা সহজলভ্য, নাগরিকদের জানার অধিকার কতখানি বিস্তৃত। সামরিক ও একনায়ক দ্বারা পরিচালিত সরকারের সাথে গণতান্ত্রিক সরকারের এটাই সবচেয়ে

বড় পার্থক্য। সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, শিক্ষা-স্বাস্থ্য-বাণিজ্য-কর প্রতিষ্ঠান, এনজিও, কর্পোরেট, দূতাবাস, রাজনৈতিক দল, আন্তর্জাতিক সংস্থা প্রভৃতি যে কোন প্রতিষ্ঠানের সকল উদ্দেশ্য, নীতিমালা ও কর্মকান্ড সম্পর্কে জানার অধিকার জনগণের রয়েছে। কাউকে সে অধিকার থেকে বঞ্চিত করা মানবাধিকার লঙ্ঘনের সমতুল্য। তথ্যে গোপনীয়তা রোধ করার জন্য জনগণের স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদানে অনিচ্ছুক ও বাধাদানকারী যে কোন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে জরিমানা ও শাস্তি প্রদানের লক্ষ্যে আইন প্রণয়ন করা জরুরী।

পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে ইতোমধ্যে তথ্য অধিকার আইন প্রণীত হয়েছে এবং সেখানকার জনগণ এর সুফল ভোগ করা শুরু করেছে। আমাদের দেশেও সম্প্রতি তথ্যের অধিকারের দাবি উচ্চকিত হয়ে উঠেছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ 'ল' কমিশন একটি আইনের খসড়া প্রণয়ন করেছে। কিন্তু তা যেমন ফাইল আবদ্ধ অবস্থায় পড়ে আছে তেমনিভাবে তাতে জনগণের কোন সম্পৃক্ততা নেই। এই আইনে কী আছে, তার থেকে কী সুফল পাওয়া যাবে সে সম্পর্কে জনগণ অবহিত না। এমন একটি আইন প্রণয়ন করতে হবে যার মধ্য দিয়ে সরকারি বেসরকারি অফিসে সংরক্ষিত সবরকমের তথ্য জনগণ জানার অধিকার অর্জন করতে পারে।

কিন্তু যে আইন প্রণীত ও গৃহীত হলে জনগণের ক্ষমতায়ন ঘটে, তাদের অধিকার নিশ্চিত হয় সেরকম আইন সহজে প্রণীত হয় না। তার জন্য প্রয়োজন অব্যাহত চাপ প্রয়োগ। যার মধ্য দিয়ে জনগনের **তথ্য অধিকার আইন** প্রণীত হবে। আবার এটাও মনে রাখা দরকার আইন হলেই তথ্যের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে না। প্রয়োজন জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং স্বত:স্ফুর্ত ও সক্রিয় অংশগ্রহণ। আশার কথা যে, সচেতন মহলে এ বিষয়ে ইতোমধ্যে ভাবনা-চিন্তা শুরু হয়েছে। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তথ্য অধিকার বিষয়ে প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশিত হয় প্রায়ই। মূলত সেরকম কিছু লেখার সংকলন বর্তমান গ্রন্থ। তবে এতে একেবারে নতুন কয়েকটি লেখাও রয়েছে। এ প্রকাশনার মাধ্যমে তথ্য পাওয়ার দাবীতে গড়ে উঠা চলতি সামাজিক আন্দোলন যদি বাড়তি গতি পায় তাহলে আমাদের প্রচেষ্টা সফল হবে। যারা ইতোমধ্যে এবিষয়ে লেখালেখিসহ নানাভাবে আন্দোলনকে বেগবান করতে সচেষ্ট হয়েছেন তাদের সকলের প্রতি রইল অশেষ কৃতজ্ঞতা।

তথ্যের অধিকার বাঁচার অধিকার

'হাম জানেঙ্গে হাম জিয়েঙ্গে'

মশিউল আলম

মরুর দেশ রাজস্থান। প্রায়ই খরা লেগে থাকে, তার ফলে মঙ্গা। তখন পুরুষেরা কাজের সন্ধানে চলে যায় অনেক দূরে দূরে। শিশুসন্তানদের নিয়ে ঘরে থেকে যায় মেয়েরা, তাদের মুখে দুমুঠো অন্ন তুলে দেবে বলে তারা কাজ খোঁজে। কাজ বলতে সরকারের মঙ্গাত্রাণ কর্মসূচি, রাস্তাঘাট নির্মাণ, কূপখনন, খাল-ডোবা সংস্কার, স্কুলভবন, স্বাস্থ্য-ক্লিনিক, গণশৌচাগার নির্মাণ এসব। সরকারের উদ্দেশ্য এসবের মধ্য দিয়ে মঙ্গা দুর্গত মানুষগুলোর জন্য কিছু আয়ের উপায় বের করা। মেয়েরা উদয়াস্ত মাটি কাটে, ইট ভাঙে, রাস্তায় পিচ ঢালে। কিন্তু দেখা গেল, তাদের অনেকেই মজুরি পায় না, বা কিছুটা পায়, পুরোটা পায় না। কী ব্যাপার? তারা যদি বাবুদের জিগ্যেস করে, আমার মজুরির কী হলো? তাহলে উত্তর আসে, তুমি তো কাজ করো নাই। তারা উপরওয়ালার কাছে যায়, উপরওয়ালারা বলে, তুমি যে কাজ করেছ, খাতায় তার প্রমাণ নাই। মজুর মেয়েরা তখন দাবি করে, আমাদের খাতা দেখান। তখন কর্তারা বলে, খাতা দেখানো যাবে না। কর্তারা মজুর মেয়েদের যাকে বলে 'হাইকোর্ট দেখানো', সেটাই করে। ১৯২৩ সালের অফিসিয়াল সিক্রেট্স অ্যাক্ট নামে ঔপনিবেশিক আমলের এক আইনের দোহাই পেড়ে তারা বলে, এসব খাতা রাষ্ট্রের গোপনীয় নথি। এগুলো জনগণের সামনে প্রকাশ করা যাবে না।

এসময় রাজস্থানের ওই প্রতারিত, শোষিত নারী মজুরদের পাশে গিয়ে দাঁড়ান অরুণা রায়। শুরু করেন তথ্য অধিকারের এক অভূতপূর্ব আন্দোলন। রাজস্থানের দেবদুঙরি গ্রামে তিনি গড়ে তোলেন 'মজদুর কিষাণ শক্তি সংগঠন' (এমকেএসএস)। গ্রামের নারীদের সংগঠিত করে অবস্থান ধর্মঘট (ধরনা), অনশন ধর্মঘট ইত্যাদি প্রচলিত ধারার কর্মসূচির মাধ্যমে শুরু করেন তাদের বৈধ ন্যূনতম মজুরি পূর্ণ পরিশোধের দাবিতে আন্দোলন। অরুণা দেখলেন, তিনি বুঝিয়ে দেওয়ার আগেই মজুর নারীরা বুঝে ফেলেছে যে তাদের সব আন্দোলনের প্রধান হাতিয়ার তথ্য। জানার অধিকার তাদের অস্তিত্ব রক্ষার অধিকার। অরুণা একটা স্লোগান তৈরি করলেন, 'হাম জানেঙ্গে, হাম জিয়েঙ্গে' - আমাদের বেঁচে

থাকতে হলে জানতে হবে। ভারত সরকার শুধু রাজস্থান রাজ্যের গ্রামীণ উন্নয়ন খাতেই বছরে ব্যয় করে ২০ কোটি মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ রুপি। এ বিপুল অর্থের কতটুকু পৌঁছে গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের কাছে? এ তথ্য জানতে হবে। তাই অরুণা আরেকটি স্লোগান তুললেন, 'হামারা পেইসা, হামারা হিসাব', আমাদের টাকার হিসাব আমরা চাই। অরুণা ও তার সহযোগীরা দাবি তুললেন, প্রত্যেকটি উন্নয়ন প্রকল্পের প্রতিটি পয়সার হিসাব জনগণকে জানাতে হবে। প্রত্যেকটি বিল, প্রতিটি ভাউচার, প্রতিটি কর্মসংস্থান তালিকা, মজুর-তালিকা জনগণের সামনে প্রকাশ করতে হবে।

'হামারা পেইসা, হামারা হিসাব', আমাদের টাকার হিসাব আমরা চাই। অরুণা ও তার সহযোগীরা দাবি তুললেন, প্রত্যেকটি উন্নয়ন প্রকল্পের প্রতিটি পয়সার হিসাব জনগণকে জানাতে হবে। প্রত্যেকটি বিল, প্রতিটি ভাউচার, প্রতিটি কর্মসংস্থান তালিকা, মজুর-তালিকা জনগণের সামনে প্রকাশ করতে হবে।

কিন্তু সরকারি কর্মকর্তা, প্রকল্প কর্মকর্তা এমনকি গ্রাম কাউন্সিলে নির্বাচিত প্রতিনিধিরাও তাদের হিসাবের খাতা জনগণের সামনে খুলে ধরতে নারাজ। তাদের হাতে রক্ষাকবচ তো আছেই-সেই অফিসিয়াল সিক্রেট্স অ্যাক্ট। কিন্তু অরুণা ও তার সহযোদ্ধারা নাছোড়, তারা আন্দোলন চালিয়ে গেলেন। এ পর্যায়ে রাজস্থানের রাজধানী জয়পুরে চলল টানা ৫৩ দিনের মিছিল, সমাবেশ, অবস্থান, অনশন ধর্মঘট। অবশেষে রাজস্থানের রাজ্য সরকার বাধ্য হলো উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের হিসাব ও নথিপত্রগুলো জনগণের জন্য উন্মুক্ত করে দিতে। এই অধিকার পাওয়ার পর একে একে বেরিয়ে আসতে লাগল জনগণের অর্থ লোপাটের চিত্রগুলো। দেখা গেল, প্রচুর সংখ্যক স্কুলভবন, স্বাস্থ্য ক্লিনিক, গণশৌচাগার নির্মাণের পেছনে প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হয়েছে, কিন্তু বাস্তবে সেগুলোর কোনো অস্তিত্ব নেই। উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর নথিপত্র বলছে-এত এত সংখ্যক কূপ খনন/সংস্কার করা হয়েছে, এতগুলো সেচের খাল, রাস্তা সংস্কারের পেছনে এত পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে সেগুলোতে কোনো শ্রমিকের হাতের ছোঁয়াও লাগেনি। মঙ্গাত্রাণের প্রকল্পে এমন অনেক লোকের নামেও মজুরির টাকা তুলে নেওয়া

হয়েছে যারা অনেক আগেই মারা গেছেন।

এই তথ্যগুলো উদ্ধার করতে গিয়ে অরুণা আবিষ্কার করেন এক অভিনব পদ্ধতি। তার সংগঠন এমকেএসএস প্রথমে কোনো উন্নয়ন প্রকল্প সম্পর্কে নথিপত্র সংগ্রহ করে। তারপর সেগুলো নিয়ে যায় প্রকল্পের জায়গায় এবং তদন্ত করে দেখে কী কাজ হয়েছে, অথবা আদৌ কোনো কাজ হয়েছে কি না। তারপর সে প্রকল্পে যারা কাজ করেছেন বলে নথিতে নাম আছে, গ্রামে গ্রামে ঘুরে তাদের সাক্ষ্য নেন। তারপর এসব সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে গণশুনানির আয়োজন করা হয়। সে শুনানিতে গ্রামের শ্রমিক মজুররা তো থাকেনই, সেই সঙ্গে আমন্ত্রণ জানানো হয় আইনজীবী, সাংবাদিক, গবেষক এবং সরকারি কর্মকর্তাসহ সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের।

এর ফলে শুরু হয় অভাবনীয় সব ব্যাপার। যেসব প্রকল্প কর্মকর্তার বিরুদ্ধে নথি জালিয়াতি, অর্থ-আত্মসাৎ ইত্যাদি অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হয় তারা শাস্তি পেতে শুরু করেন। আত্মসাৎকৃত অর্থ পঞ্চায়েতের কোষাগারে ফেরত দিতে বাধ্য করা হয়। এ ছাড়া যেসব মজুর অনেকদিন ধরে কোনো মজুরি পাননি, তারা রাতারাতি বকেয়া মজুরি পেতে শুরু করেন। প্রকল্প কর্মকর্তা বা গ্রাম পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধি প্রতারিত মজুরের সঙ্গে দেখা করে বকেয়া টাকা পরিশোধ করে বলেন, 'টাকা তো পেলে বাপু, আর দয়া করে গণশুনানিতে সাক্ষ্য দিতে যেও না' ইত্যাদি।

অরুণা রায় ও তার মজদুর কিষাণ শক্তি সংগঠনের তৃণমূল পর্যায়ের আন্দোলন রাজস্থানের দেবদুঙরি গ্রামসহ পাঁচটি জেলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। সীমাবদ্ধ থাকেনি গরিব মানুষের কাজ, মজুরি, রেশনের অধিকার ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে দুর্নীতি দমনের আন্দোলনের মধ্যে। অল্প সময়ের মধ্যেই তা ছড়িয়ে পড়ে রাজস্থানের বাইরেও এবং তা রূপ নেয় জনগণের তথ্য জানার অধিকার নিশ্চিত করার জন্য 'তথ্য অধিকার আইন' প্রণয়নের দাবিতে বিরাট এক আন্দোলনে। সে আন্দোলনে ভারতের জাতীয় গণমাধ্যম, বিশিষ্ট অনেক আইনজীবী, সাবেক বিচারপতি, বুদ্ধিজীবী, মানবাধিকার কর্মী ও রাজনৈতিক সংস্কার আন্দোলনের নেতারা অংশ নেন। ভারতের যে চারটি রাজ্যে প্রথম তথ্য অধিকার আইন পাশ হয়, রাজস্থান তাদের অন্যতম। তারপর এ বছর জুন মাসে কেন্দ্রীয়ভাবে গোটা ভারতের জন্যই তথ্য অধিকার আইন পাশ হয়েছে এবং গত অক্টোবর থেকে এর বাস্তবায়ন শুরু হয়ে গেছে।

অরুণা রায়কে দেখার ও তার কথা শোনার সুযোগ হয়েছিল কদিন আগে। বাংলাদেশের বেসরকারি সংস্থা 'মানুষের জন্য' আয়োজিত 'তথ্য জানার অধিকার : জাতীয় ও আঞ্চলিক পরিপ্রেক্ষিত' শীর্ষক দুদিনব্যাপী এক সম্মেলনে (১৩-১৪ ডিসেম্বর ২০০৫) অংশ নিতে তিনি ঢাকা এসেছিলেন। রাজধানীর বিয়াম মিলনায়তনে নিজেদের সংগঠনের কাজের অভিজ্ঞতা, রাজস্থানের দরিদ্র নারীদের বেঁচে থাকার জন্য তথ্য জানার অধিকারের সংগ্রামের বিবরণ তার কণ্ঠে শুনতে শুনতে অভিভূত হয়ে গিয়েছিল হলভর্তি কয়েক শ মানুষ।

বিদেশি ঋণ সুদসহ পরিশোধও করতে হয় জনগণকেই। কিন্তু উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে যে ব্যাপক দুর্নীতি চলে, শত শত কোটি টাকা লোপাট করে দেওয়া হয় তা বোধ হয় আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এ ব্যাপারে অরুণা রায়, রাজস্থানে তার মজদুর কিষাণ শক্তি সংগঠন ও তাদের সংগঠিত নারী মজুরদের সংগ্রামের কাহিনী কি আমাদের একটুও ভাবাতে পারে না।

অরুণা রায় ভারতের প্রশাসন সার্ভিসে সাত বছর চাকরি করার পর এক পর্যায়ে উপলব্ধি করেন, তার দেশের কোটি কোটি গরিব গ্রামীণ জনগণের দুঃখ-দুর্দশা-শোষণ-বঞ্চনার খানিকটা লাঘবের চেষ্টা করা উচিত, কিন্তু ভারত সরকারের একজন অভিজাত কর্মকর্তার পদে বসে থেকে সেটা করা সম্ভব হবে না। তিনি সরকারি চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে যান নিজের রাজ্য রাজস্থানে। সেখানে কয়েক বছর কাজ করেন 'সোশ্যাল ওয়ার্ক অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার' নামে এক গবেষণা প্রতিষ্ঠানে। তারপর ১৯৯০ সালে গড়ে তোলেন মজদুর কিষাণ শক্তি সংগঠন (এমকেএসএস)। এ সংগঠন বিদেশি দাতাদের কোনো অনুদান গ্রহণ করে না, দেশের বড় বড় এনজিওদেরও সযত্নে এড়িয়ে চলে। অরুণা রায় ২০০০ সালে ম্যাগসেসে পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন, পুরস্কারের প্রাপ্ত অর্থ পুরোটাই দান করেছেন মজদুর কিষাণ শক্তি সংগঠনকে।

তথ্যের অধিকার নিয়ে আমাদের দেশেও কয়েক বছর ধরে কথাবার্তা, লেখালেখি, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম ইত্যাদি চলছে। 'অবাধ তথ্য প্রবাহ' শব্দবন্ধটিও এদেশে

ইদানীং বেশ ব্যবহৃত হচ্ছে। বাংলাদেশে বোধ হয় এমন ধারণাই বেশি যে তথ্য অধিকার আইন মূলত সংবাদিকদের বা সংবাদমাধ্যমের ব্যাপার। এর ফলে সাংবাদিকরাই সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবেন। অনেকে বলেন, বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদে যে 'বাক ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা এবং সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতা'র নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে, তথ্য অধিকার আইন সেটার সঙ্গে সম্পর্কিত। এ ধারণা অবশ্যই ঠিক, কেননা ভাব প্রকাশের জন্য বা সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতার চর্চার জন্য তথ্য জানার অধিকার থাকতে হবে। তবে অরুণা রায় ও ভারতের সুশীল সমাজের তথ্য অধিকার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যে বিষয়টি ভালোভাবে চিহ্নিত হয়েছে, সেটা হচ্ছে তথ্য জানার অধিকার শুধু বাক ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা বা সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়, এটা আরো বড় মৌলিক অধিকারের সঙ্গে সম্পকির্ত। অরুণা রায়রা যে স্লোগান দিয়েছেন, 'আমরা জানব আমরা বাঁচব' -এটাই ভারতীয়রা তথ্যের অধিকারের প্রধান বিষয় বলে চিহ্নিত করেছেন। জানার অধিকারকে তারা বেঁচে থাকার হাতিয়ার হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। আর বেঁচে থাকার অধিকার মানুষের মৌলিকতম অধিকার। ভারতের সংবিধানের ২১ অনুচ্ছেদ, যেখানে 'রাইট টু লাইফ অ্যান্ড লিবার্টি'র নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে, তথ্যের অধিকার মূলত এবং প্রধানত তারই সঙ্গে সম্পর্কিত বলে ভারতীয়রা সিদ্ধান্তে পৌছেছেন।

বাংলাদেশের সংবিধানেও প্রায় একই রকম একটি অনুচ্ছেদ রয়েছে। যেমন, ২০ অনুচ্ছেদের ১ উপ-অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'কর্ম হইতেছে কর্মক্ষম প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষে অধিকার, কর্তব্য ও সম্মানের বিষয় এবং প্রত্যেকের নিকট হইতে যোগ্যতানুসারে ও প্রত্যেককে কর্মানুযায়ী-এই নীতির ভিত্তিতে প্রত্যেকে স্বীয় কর্মের জন্য পারিশ্রমিক লাভ করিবেন।' এ ছাড়া সংবিধানের ১৫ অনুচ্ছেদের একাধিক উপ-অনুচ্ছেদে বর্ণিত মৌলিক অধিকারগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও তথ্য জানার অধিকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বাংলাদেশে প্রতি বছর উন্নয়ন খাতে হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। এ টাকার অর্ধেকের বেশি বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ থেকে ঋণ নেওয়া হয়। বর্তমান অর্থবছরের উন্নয়ন বাজেট প্রায় বাইশ হাজার কোটি টাকা। এ টাকা জনগণের। বিদেশি ঋণ সুদসহ পরিশোধও করতে হয় জনগণকেই। কিন্তু উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে যে ব্যাপক দুর্নীতি চলে, শত শত কোটি টাকা লোপাট করে দেওয়া হয় তা বোধ হয় আর বলার

অপেক্ষা রাখে না। এ ব্যাপারে অরুণা রায় রাজস্থানে তার মজদুর কিষাণ শক্তি সংগঠন ও তাদের সংগঠিত নারী মজুরদের সংগ্রামের কাহিনী কি আমাদের একটুও ভাবাতে পারে না। যারা 'দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র' নামে এক বিরাট দলিল রচনা করেছেন, তাদের বিবেচনায়ও এ বিষয়টি ধরা দেয়নি যে, উন্নয়ন খাতে জনগণের অর্থ ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য জনগণের জন্য সহজলভ্য করা দরকার, সোশ্যাল অডিটের ব্যবস্থা রাখা দরকার-এ ধরনের কথা ওই কৌশলপত্রে উল্লেখ করা উচিত ছিল।

ভালো কথা যে, আমাদের দেশে তথ্য অধিকার আইনের পক্ষে জনমত ক্রমেই জোরালো হচ্ছে। এ ধারণাও কেটে যাচ্ছে যে, এটা শুধু সাংবাদিকদের বা সংবাদমাধ্যমের ব্যাপার। অরুণা রায় 'মানুষের জন্য'র আয়োজিত সম্মেলনে এসে তার সংগ্রাম ও অর্জনের কাহিনী শুনিয়ে আমাদের চোখ আরো খুলে দিলেন। রাজস্থানের মতো বাংলাদেশেও তথ্য অধিকার আইনের দাবিতে আন্দোলন শুরু হোক একদম তৃণমূল পর্যায় থেকে, স্থানীয় সরকারের সর্বনিম্ন স্তর ইউনিয়ন পরিষদ থেকে। এর মধ্য দিয়েই তথ্য অধিকার আইনের দাবিতে জাতীয় পর্যায়ের আন্দোলন বেগবান হতে পারে।

লেখক: লেখক ও সাংবাদিক, ২০ ডিসেম্বর ২০০৫।

অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট বহাল রেখে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সম্ভব নয়

মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর

আমাদের দেশের সরকার, বিশেষ করে তথ্যমন্ত্রিরা প্রায়ই বলে থাকেন 'দেশে সংবাদপত্রের পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে।' বিএনপি ও আওয়ামী লীগ উভয় সরকারই এ রকম দাবি করে থাকে। দাবিটা যে পুরোপুরি ঠিক নয় তা বলা যাবে না। দাবিটা অনেকাংশেই ঠিক। '৯০-পূর্ববর্তী দেশের সঙ্গে তুলনা করলে দাবিটার যৌক্তিকতা আছে তা মানতে হবে। কিন্তু সরকার বা তথ্যমন্ত্রীরা যা বলেন না, তা হলো-দেশে 'অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট' বাতিল করা না হলে দেশে সংবাদপত্রের পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে বলে দাবি করা যায় না।

অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট বহাল থাকলে একজন সাংবাদিকের পক্ষে সরকারের নানা দুনীর্তির বা অনিয়মের কাগজপত্র দেখা সম্ভব হয় না। আর প্রাসঙ্গিক কাগজপত্র না দেখে কোন সাংবাদিক পক্ষে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা করা সম্ভব হয় না। অনেক পাঠক এ বিষয়টি হয়তো জানেন না। তারা ভাবেন, 'আমাদের সাংবাদিকরা ভীরু। তারা সরকারের দুর্নীতির খবর তুলে আনতে ভয় পান।' সব সাংবাদিক সাহসী বা কর্তব্যপরায়ণ তা দাবি করা যাবে না। তবে বেশির ভাগ সাংবাদিকই সাহসী ও দায়িত্বপরায়ণ।

সংবাদপত্রে মাঝে-মধ্যে সরকারের নানা বিভাগের দুর্নীতির খবর ছাপা হয়। নানা মানুষের সুত্রে এ খবরগুলো সংবাদপত্রে আসে। কিন্তু ভাসা ভাসা খবর ছাড়া দুর্নীতির তেমন গভীর ও তথ্যবহুল খবর প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। ফলে দুর্নীতিবাজ মন্ত্রী, এমপি, রাজনৈতিক নেতা ও সরকারি কর্মকর্তাদের দুর্নীতির বিস্তারিত খবর মিডিয়ায় আসতে পারেনা। পাঠকের জন্য এটা এক বড় হতাশা। শুধু ভাসা ভাসা খবর থেকেই 'ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল' যে তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছে তাতেই বিশ্বের মধ্যে বাংলাদেশ দুর্নীতিতে প্রথম স্থান পেয়ে গেছে। যদি সরকারি বাধা ডিঙ্গিয়ে দুর্নীতির সব তথ্য মিডিয়ায় প্রকাশ করা যেত তা হলে 'বাংলাদেশ' আরো কত উপরে স্থান পেত তা শুধু এখন কল্পনা করা যেতে পারে।

সরকারের বিভিন্ন মুখপাত্র প্রায়ই বলে থাকেন, অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট বাতিলের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কিন্তু আইন মন্ত্রণালয়ের একটি অংশ আগ্রহী নয়। তারা এ ব্যাপারে সরকারকে 'গো স্লো' নীতি অবলম্বনের পরামর্শ দিয়েছেন।

এ অ্যাক্টের কারণে সাংবাদিকরা কোথায় ও কী তথ্য সংগ্রহ করতে পারেননি তার একটু প্রচার হওয়া দরকার। শুধু মুখে মুখে বললে দর্শক, পাঠকরা এর গুরুত্ব বুঝতে পারবেন না। দর্শক, পাঠকরা তখন দেখবেন, শুধু একটি কালো আইন বলবৎ রয়েছে বলে সাংবাদিকরা বিশেষ কোনো মন্ত্রীর বা সরকারি অফিসের দুর্নীতির তথ্য সংগ্রহ করতে পারছেন না। প্রতি মাসে যদি দৈনিক বা সাপ্তাহিক পত্রিকায় তথ্য সংগ্রহ করতে না পারা খবরের একটি তালিকা প্রকাশিত হয় তাহলে দর্শক-পাঠকরা এ ব্যাপারে সরকারের ওপর চাপ দিতে পারেন। দর্শক পাঠকরা যদি এ ব্যাপারে সচেতন হন এবং এই কালো আইন প্রত্যাহারের দাবিতে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করেন তাহলে একটা ফল পাওয়া যেতে পারে। দর্শক, পাঠকরা সচেতন হলে সাংবাদিকরা তাদের দায়িত্বের প্রতি আরো যত্নবান হবেন বলে আশা করা যায়। যত্নবান হওয়ার কথা বলছি এ জন্য যে 'অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট'-এর থাবা পড়বে না এমন অনেক দুর্নীতির বিষয়ও সাংবাদিকরা লেখেন না। অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার মতো শ্রমঘন কাজের ব্যাপারে অনেক সাংবাদিকই আগ্রহী নন।

দর্শক পাঠকরা যদি এ ব্যাপারে সচেতন হন এবং এই কালো আইন প্রত্যাহারের দাবিতে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করেন তাহলে একটা ফল পাওয়া যেতে পারে। দর্শক, পাঠকরা সচেতন হলে সাংবাদিকরা তাদের দায়িত্বের প্রতি আরো যত্নবান হবেন বলে আশা করা যায়।

শুধু দুর্নীতি কেন, নানা রকম সরকারি চুক্তি নিয়েও বেশ ভালো অনুসন্ধানী রিপোর্ট লেখা যায়। বেশীরভাগ সময় সাংবাদিকরা চুক্তির কথা তোতা পাখির মতো লিখে যান। চুক্তির সম্পূর্ণ বয়ান চোখেও দেখেন না। দেখার আগ্রহও হয় না অনেকের। একটি স্বাধীন দেশে তথ্য জানার অধিকার সবার রয়েছে। শুধু রাষ্ট্রীয় সিকিউরিটি সংক্রান্ত বিষয় ছাড়া অন্য যেকোনো বিষয়ে তথ্য জানার অধিকার সকলের রয়েছে।

বিশেষ করে সাংবাদিকের অধিকার এ ব্যাপারে সর্বাগ্রে। জনগণের সঙ্গে যেসব প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম জড়িত সেসব প্রতিষ্ঠনের তথ্য নিয়ে 'ঢাক ঢাক গুড় গুড়' মনোভাব ভালো নয়।

সুযোগ পেলেই আমরা সরকার বা সরকারি প্রতিষ্ঠানের উপর দোষ চাপাই। কিছু দিন আগে এ সংক্রান্ত এক সেমিনারে একজন বক্তা বলেন, 'সাংবাদিকরা এনজিওদের সম্পর্কেও তথ্য জানতে পারে না। তথ্য দেওয়ার ব্যাপারে এনজিওদের অসহযোগিতা করতে দেখা যায়।' সভায় উপস্থিত একজন এনজিও নেতা বলেন, এ অভিযোগ অসত্য নয়।

এনজিওদের পক্ষে আমি একটা কথা বলব। বড় ও মাঝারি প্রায় সব এনজিওই বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশ করে। সেখানে থাকে অডিট রিপোর্টও। বাংলাদেশে কোন সরকারি প্রতিষ্ঠানটি বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশ করে অডিট রিপোর্টসহ? যদি করেও থাকে তার সংখ্যা খুব কম। অন্তত বার্ষিক রিপোর্টে একটি প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম জনসমক্ষে স্পষ্ট হয়।

বাংলাদেশে এখন ইলেক্ট্রনিক মিড়িয়ায় সাংবাদিকতা দ্রুত বিকশিত হচ্ছে। কিন্তু ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া ঘটনার বিবরণ যত বিশ্বস্ততার সঙ্গে তুলে ধরছে সরকারের নানা বিভাগের দুর্নীতি, চোরাচালান, ঘুষ ইত্যাদি সম্পর্কে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তেমন চোখে পড়ে না। দর্শক-পাঠকের ওপর ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার প্রভাব খুব বেশী। সরকারের বা প্রাইভেট সেক্টরের নানা অপকর্ম ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় তুলে ধরতে পারলে তা সমাজে ইতিবাচক প্রভাব ফেলত। কিন্তু অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্টের কারণে অনেক সময় ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াও সরকারি নথিপত্র দেখার সুযোগ পায়না।

বাংলাদেশের সরকারি প্রশাসন খুব ধীরগতিতে তথ্যপ্রযুক্তির সুবিধা গ্রহণ করছে। জেলা বা উপজেলা তো বটেই, খোদ রাজধানীর সচিবালয়েও এখনো মান্ধাতা আমলের টাইপরাইটার দেখা যায়। কম্পিউটার প্রযুক্তি এখনো সরকারি প্রশাসন আত্মস্থ করতে পারেনি। তবে প্রশাসনের একটা বড় এলাকায় কম্পিউটার স্থাপিত হয়েছে। তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় সরকারি অফিসে স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা করা যায়। সরকারের প্রাসঙ্গিক সব নথি বা দলিল যদি ইন্টারনেট বা ওয়েব সাইটে দিয়ে দেওয়া যায় তাহলে আগ্রহী যেকোনো ব্যক্তি তার প্রয়োজনমতো নথি বা দলিল ইন্টারনেটে দেখতে পারতেন।

একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। সম্প্রতি ঢাকা সিটি করপোরেশনের উদ্যোগে একটি ফ্লাইওভার নির্মাণ নিয়ে নানা অনিয়মের খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। অভিযোগ করা হয়েছে, ওই ফ্লাইওভারের সর্বনিম্ন দরপত্র দুর্নীতির মাধ্যমে টাকার অংক বাড়ানো হয়েছে। এখন যদি এই ফ্লাইওভারের যাবতীয় টেন্ডার ডকুমেন্টস ওয়েব সাইট বা ইন্টারনেটে দেখার সুযোগ থাকত তাহলে সাংবাদিকরা তো বটেই আগ্রহী যেকোনো সাধারণ মানুষও প্রতিটি দলিল দেখতে পেতেন। ফ্লাইওভারের একটি চিঠি বা কাগজও সরকারের 'অতি গোপনীয়' দলিল হতে পারে না।

সম্প্রতি ঢাকা সিটি করপোরেশনের উদ্যোগে একটি ফ্লাইওভার নির্মাণ নিয়ে নানা অনিয়মের খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। অভিযোগ করা হয়েছে, ওই ফ্লাইওভারের সর্বনিম্ন দরপত্র দুর্নীতির মাধ্যমে টাকার অংক বাড়ানো হয়েছে। এখন যদি এই ফ্লাইওভারের যাবতীয় টেন্ডার ডকুমেন্টস ওয়েব সাইট বা ইন্টারনেটে দেখার সুযোগ থাকত তাহলে সাংবাদিকরা তো বটেই আগ্রহী যেকোনো সাধারণ মানুষও প্রতিটি দলিল দেখতে পেতেন।

সরকার যদি জবাবদিহিতা বা স্বচ্ছতায় বিশ্বাস করে তাহলে মন্ত্রীসভায় একটি সিদ্ধান্ত নিতে পারে: "১ কোটি টাকার বেশি যেকোনো টেন্ডার বা ক্রয় হলে তার সম্পূর্ণ কাগজপত্র, প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পত্রবিনিময় ওয়েব সাইটে দেওয়া হবে। ওয়েব সাইটের বাইরে একটি কাগজও থাকলে তা 'দুর্নীতি' বলে বিবেচিত হবে।" 'সমরাস্ত্র' ক্রয়, ফেরি মেরামতে ডেনিশ সহযোগিতা, বিটিটিবির 'মোবাইল ফোন' টেন্ডারের যাবতীয় কাগজপত্র যদি জনগণ ওয়েব সাইটে দেখার সুযোগ পেত তাহলে সরকারের অনেক অপবাদ হজম করতে হতো না। সরকারের একটি মহল হয়তো এখন 'অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট'কে দেখিয়ে বলবে, 'আইনের কারণে আমরা তা প্রকাশ করতে পারছি না।

প্রতি বছর ৩ মে 'ওয়ার্ল্ড প্রেস ফ্রিডম ডে' আসে আর সংবাদপত্রে এ নিয়ে লেখালেখি হয়। সেমিনারে গরম গরম বক্তৃতা হয়। তারপর আমরা আগের

অবস্থানে ফিরে যাই। 'অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট' যথারীতি নানা রাজনীতি আর আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় মন্ত্রণালয়ে আটকে থাকে। কারণ আমলারা এর পথে এক বড় বাধা। তারাই হয়তো মন্ত্রীকে ভয় দেখান। এ অ্যাক্ট না থাকলে সরকারের সব জারিজুরি ফাঁস হয়ে যাবে।

এ ব্যাপারে আমাদের প্রধান বিরোধী দলের বক্তব্য কী তা জানা যায়নি। নির্বাচনে জিতলেই যারা সরকার গঠন করবে তারা এ ব্যাপারে কী বলেন? কোনো সংবাদপত্র কি এ ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলোর মতামত সংগ্রহ করবেন? শুধু এ অ্যাক্টই নয়, সরকারি বেতার ও টিভি, প্রেস কাউন্সিলের ক্ষমতা বৃদ্ধি, ডিএফপির দুর্নীতি, সরকারি বিজ্ঞাপনের বিকেন্দ্রীকতা, প্রাইভেট সেক্টরে বেতার-টিভির লাইসেন্স ইত্যাদি তথ্য মন্ত্রণালয়ের নানা ইস্যুতে রাজনৈতিক দলগুলোর বক্তব্য পারলে ভালো হতো।

এবার সংবাদপত্র সম্পর্কে দু-একটা কথা বলে এ প্রসঙ্গ শেষ করি। কয়েকদিন আগে এমএমসি আয়োজিত এক সেমিনারেও কথাটা উঠেছিল। তা হলো: সংবাদপত্র বা সাংবাদিকরা সরকারের তথ্য জানার অধিকার সম্পর্কে সোচ্চার। এনজিওদের তথ্যও তারা জানতে চান। কিন্তু পাঠক বা দর্শক কি সংবাদপত্র বা বিভিন্ন টিভি চ্যানেলের সব তথ্য জানতে পারেন? জানার কোনো সুযোগ আছে? একজন বক্তা সেমিনারে বলেছিলেন, 'সংবাদপত্র কর্তৃপক্ষ জানাতে রাজি নয়।' অভিযোগটা কি অসত্য? শুধু সার্কুলেশন সংখ্যা জানতে আমি আগ্রহী নই। একটা নতুন পত্রিকা বা টিভি চ্যানেল যখন হৈ হৈ করে চালু হয় তখন অনেকের জানতে আগ্রহ হয়, কারা এ পত্রিকার মূলধন যুগিয়েছেন? কত টাকা সেই মূলধন? কোম্পানির প্রধান কে? ডাইরেক্টররা কারা? এগুলো কোনটাই কোম্পানির গোপন তথ্য নয়। সরকারের খাতায় সবার নাম রয়েছে। তবে পাবলিক জানতে পারে না। অনেক সংবাদপত্র বা মিডিয়া প্রতিষ্ঠানের মালিকানা নিয়ে বেশ ধোঁয়াটে ভাব রয়েছে। ঢাকার একটি বহুল প্রচারিত বাংলা দৈনিকের মালিকানায় ভারতীয় একটি কোম্পানির শেয়ার রয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এ রকম অস্পষ্টতা ঠিক নয়।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি প্রস্তাব করব: প্রতিটি সংবাদপত্র, টিভি চ্যানেল বা মিডিয়া প্রতিষ্ঠান তাদের বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশ করুক। বছরে তাদের নানা কর্মকান্ড, কী কী খাত থেকে কত আয় করেছে, ব্যয়ের খাতের একটি অডিট রিপোর্টসহ তা

প্রকাশ করা হোক। ওয়েব সাইটে দেওয়া হোক। আশা করি সংবাদপত্র তাদের কোনো তথ্য গোপন করবে না। সংবাদপত্রের জন্য নিশ্চয় অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট প্রযোজ্য নয়।

সংবাদপত্র বা মিডিয়া যখন তার সব তথ্য জনসমক্ষে প্রকাশ করার সৎ সাহস দেখাবে কেবল তখনই সরকারের বা এনজিওর সব তথ্য জানার নৈতিক অধিকার মিডিয়ার থাকবে। নিজের তথ্য কাউকে জানতে না দিয়ে অন্যের তথ্য জানার অধিকার নিয়ে হৈচৈ করলে লাভ হবেনা। গণতান্ত্রিক সমাজে কোনো প্রতিষ্ঠানই জবাবদিহিতার উর্ধ্বে নয়।

লেখক : সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক।
সূত্র : প্রথম আলো, ২২ মে ২০০৪।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও ব্যক্তি মানুষের তথ্য-অধিকার

রোবায়েত ফেরদৌস

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা: মালিকের, পাঠকের, সাংবাদিকদের না বাজারের?

সংবাদপত্রের স্বাধীনতার বিষয়টি গেলো দু'শ' বছর ধরে নানাভাবে আলোচনা সমালোচনা, পর্যালোচনায় এলেও ধারণা-নিচয়টি এখনো বেশ গোলমেলে। একেক গোষ্ঠী–পাঠক, মালিক, সাংবাদিক, আইনজ্ঞ, রাজনীতিকগণ–নিজ নিজ কাঠামোয় ফেলে এর ব্যাখ্যা বয়ানের চেষ্টা করেছেন। রাষ্ট্র একভাবে আবার এর নাগরিকরা অন্যভাবে বিষয়টিকে দেখবার প্রয়াস পেয়েছেন। উদারপন্থী আর রক্ষণশীলদের মাঝেও এ নিয়ে মতবিরোধ আছে। বিরোধ আছে অ্যাকাডেমিশিয়ান আর প্রাকটিশনারদের মাঝেও। প্রপঞ্চটিকে আমরা খুঁজে পাবো মত প্রকাশের স্বাধীনতার বড় ক্যানভাসের ভেতরে। তাই ডিসকোর্স 'সংবাদপত্রের স্বাধীনতা' নিয়ে কথা পাড়লেই, আমার প্রতীতী বলে, কয়েকটি বিষয় হাত ধরাধরি করে উঠে আসে; এবং বলা কেবল বাহুল্য যে, উঠে আসা বিষয়গুলো পরস্পর আন্ত:সম্পর্কিত। মোটা দাগে, আমরা বিবেচনায়, বিষয়গুলো হলো **এক.** রাষ্ট্রীয় সম্পদ ও সুযোগের বন্টন ব্যবস্থা–যার ওপর নির্ভর করে একটি রাষ্ট্রে ব্যক্তি মানুষের ক্রয়ক্ষমতা, **দুই.** রাষ্ট্রে ভাব বা মত প্রকাশের সুযোগ ও স্বাধীনতা কতটা চর্চিত হয় তার সামাজিক প্রকৃতি ও আইনি কাঠামোর স্বরূপ, **তিন.** শিক্ষিতের হার, **চার.** তথ্য উৎপাদন এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে জনগণের প্রবেশাধিকারের মাত্রা, **পাঁচ.** জনগণের রাজনৈতিক চেতনা ও সাংস্কৃতিক মান ইত্যাদি। নিচের অনুচ্ছেদগুলোয় আমি এসব চলকের ব্যাখ্যা-বায়নের চেষ্টা করবো। স্পষ্ট করে বললে বিশ শতকের আগে মত প্রকাশের স্বাধীনতার বিষয়টি ছিল আন্দোলন বা অধিকার হিসেবে 'স্বীকৃতি আদায়ের' বিষয়। কারণ চরিত্রগত দিক দিয়ে রাষ্ট্র তখন স্বৈরতান্ত্রিক ছিল। জনসম্মুখে নিজের মতামত মুক্তভাবে প্রকাশ করাটাই তখন মুখ্য ছিল। এর একটি দার্শনিক ভিত্তিও রয়েছে। যে কারণে মত বা ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা নিয়ে সেই সপ্তদশ শতকে ব্রিটিশরাজের সঙ্গে লড়াইয়ে মেতে উঠেছিলেন ইংরেজ কবি মিল্টন। অ্যারিওপ্যাজিটিকায় তার উচ্চারণ ছিল এরকম: দাও আমায়, জ্ঞানের স্বাধীনতা দাও, কথা কইবার স্বাধীনতা

দাও, মুক্তভাবে বিতর্ক করার স্বাধীনতা দাও। তবে জরুরী যে প্রশ্নটি থেকে যায় তা হলো এই যে, স্বাধীনতা চাওয়া হয়েছিল সেটি কার কাছ থেকে? স্বাধীনতা চাওয়া হয়েছিল, চার্চ ও রাষ্ট্র থেকে- কারণ ক্ষমতার বিলি-বন্টন তখন এদুটো প্রতিষ্ঠানই করতো; এই ক্ষমতাকেন্দ্র দুটো তখন সমার্থক ছিল। তারাই সব নিয়ন্ত্রণ করতো—দেহ, দেহের খোরাক এবং আত্মাও। এখনকার পরিভাষায় হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার—দুটোই।

সরকারি অফিসারদের কথা বলা যায়, তারা কিন্তু তথ্য জানে তাদের জানানোর অধিকার দেয়া হয়নি। তাই তথ্য জানা এবং জানানোর অধিকার—দুটো দিকে খেয়াল রাখার উপর তাগিদ দেয়া হচ্ছে। তথ্য অধিকার তাই কেবল সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা নয়, নয় কেবল সাংবাদিকের তথ্য প্রাপ্তির স্বাধীনতা, বড় অর্থে এটা আসলে সমাজের স্বাধীনতা, সমাজস্থ মানুষের তথ্য প্রাপ্তির স্বাধীনতা।

পরে দেশে দেশে রাষ্ট্রীয় চরিত্রে পুঁজিবাদের বিকাশ হয়েছে এবং পুঁজিবাদের অন্যতম অনুষঙ্গ হিসেবে শিল্পায়ন, নগরায়ন, মুক্তবাজার অর্থনীতির স্বভাবটি বিকশিত হয়েছে, রাষ্ট্রীয় সম্পদ ও সেবার বিরাষ্ট্রীয়করণ ঘটেছে, তার সমান্তরালে জনপরিসরও বাজারমুখী হয়েছে, নিয়েছে অতি বাণিজ্যিকরণের তকমা। সংবাদপত্র শিল্পেও নতুন নতুন প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের প্রসার ঘটেছে; শিল্পের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো এখানেও উৎপাদন-বন্টন, শ্রমবিভাজন ও অফিস ব্যবস্থপনার নয়া পরিচালন পদ্ধতি আবিস্কৃত হয়েছে। সংবাদপত্র চেষ্টা করেছে কর্পোরেট দুনিয়ার নয়া সংস্কৃতিকে নিজের ভেতর অভিযোজিত করে নিতে এবং দেশে দেশে তা সফলও হয়েছে অনেকখানি। প্রযুক্তির অমিত সম্ভাবনাকে কাজে লগিয়ে সংবাদপত্র তার উৎপাদনের গতি বাড়াতে সক্ষম হয়েছে; গণউৎপাদন এভাবে গণভোক্তা শ্রেণী তৈরি করতে সহায়তা যুগিয়েছে। গণভোক্তা তৈরির কাজে বড় ভূমিকাটি রেখেছে আসলে বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে সংবাদপত্রের গণচরিত্র তৈরি হয়েছে। কাগজের আধেয় পড়ার বাইরে কেবল বিজ্ঞাপন ব্যবহারের জন্য নতুন গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে। সংবাদপত্রের আয়ের অন্যতম উৎস হয়ে দাড়িয়েছে বিজ্ঞাপন। বাংলাদেশের

প্রেক্ষাপটে উৎপাদন খরচের হিসাবে যে কাগজের দাম ১৬ টাকা তা যে ৮ টাকায় দেয়া সম্ভব হয় তাও বিজ্ঞাপনের জন্য। অন্যদিকে একটি কাগজের বিপুল সার্কুলেশন থাকা সত্ত্বেও যদি পর্যাপ্ত বিজ্ঞাপণ না থাকে তবে এটি বন্ধ হয়ে যেতে পারে! এভাবে বিজ্ঞাপন ও সংবাদ–দুজনে দুজনার হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরস্পর পরস্পরকে পুষ্ট করে তুলছে। বর্তমান সময়ে এসে 'বাজারের মুক্তপ্রকাশ' ও 'মুক্তপ্রকাশের বাজার' সমার্থক হয়ে গেছে। 'তথ্যের অবাধ প্রবাহ' টিকে থাকার স্বার্থেই নিজেকে কমপ্যাটিবল করে নিয়েছে 'পুঁজির অবাধ প্রবাহ'- এর সঙ্গে।

একদল বলেন, সংবাদপত্রের গণ চারিত্র তৈরি হওয়ায় সংবাদপত্রের 'গণতন্ত্রায়ন' ঘটেছে। কিন্তু অন্যরা খুব যুৎসইভাবে আর যে প্রশ্ন তোলেন তাহলো, এই গণতন্ত্রায়ন কোন অর্থে? কার স্বার্থে? বৃহত্তর পাঠকের জন্য এটি কী মানে যোগ করে? তারা তো কেবল সংবাদপত্রের কপি কেনার সুযোগ পেয়েছে, একজন ভোক্তা হিসেবে কপি কিনে উল্টেপাল্টে পড়ার স্বাধীনতা পেয়েছে। তবে এটা দেখাও খুব জরুরি বিষয় যে, একটি কাগজ তারা বাজার থেকে কিনে পড়তে পারেন, ভাবনায় রাখা দরকার, সংবাদপত্রে স্পেসের সীমাবদ্ধতার কারণে কতগুলো ঘটনা আসলে সংবাদ হিসেবে উপস্থাপিত হতে পারে? দেখতে হবে সংবাদপত্র তার পলিসির নিরিখে কোন ঘটনাকে কতোটা ট্রিটমেন্ট দেয়? সংবাদপত্রের 'এজেন্ডা সেটিং' ভূমিকাই- বা কেমন? দেখার বিষয় দেশে শিক্ষার হার কতো? আর কেবল নাম মকশো করতে পারলেই তো চলবেনা খতিয়ে দেখতে হবে ঠিক কত শতাংশ মানুষের শিক্ষার স্তর ও সাংস্কৃতিক মান ওই পর্যায়ের যে তারা খবরের কাগজ পড়তে পারেন? জানা তথ্য মতে, ১৪ কোটি মানুষের এই দেশে সব কাগজের সম্মিলিত সার্কুলেশন এখনো ১০ লাখ নয়, আর খসড়া হিসেবে পাঠক সংখ্যা ৫০ লাখ অতিক্রম করবে কিনা সন্দেহ। কাজেই এ প্রশ্ন সঙ্গত কারণেই আসে সংবাদপত্রের মালিকানা বা আধেয়র ওপর জনগণের নিয়ন্ত্রণ বা তাদের প্রবেশাধিকার কি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? এটা কি কেবল মালিকের স্বাধীনতা? হাতে গোনা কয়েকজন ক্ষমতাধর সক্ষম মুষ্টিমেয় শিক্ষিত পাঠকের স্বাধীনতা? জনসংখ্যার পঞ্চাশ ভাগ নারী। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই তথ্যটি বিবেচনায় এনে সংবাদপত্রে নারীর প্রবেশাধিকার নিয়ে কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করলে বোধকরি ধারণাটি স্পষ্ট হবে। **এক.** সাবজেক্ট হিসেবে সংবাদপত্রে নারীর উপস্থাপন কত অংশ জুড়ে থাকে? **দুই.** সংবাদপত্রে কতজন নারী সাংবাদিক কাজ করেন? **তিন.** সংবাদপত্রে তাদের পদ ও কার্যপ্রকৃতি কেমন? **চার.** কতজন নারী সংবাদপত্র মালিকানার সঙ্গে জড়িত?

পাঁচ. সংবাদপত্রে নারী যে প্রতিকৃতি আমরা পাই তা কতটা ইতিবাচক? শব্দচয়ন, ভাষার ব্যবহার ও ছবি ব্যবহারে সাংবাদিকরা কতটা জেন্ডার সংবেদনশীল? কেউ কেউ যে বলেন, 'ম্যাসমিডিয়া'- বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে উপরের প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজলে এর যৌক্তিকতা মিলবে। অন্যদিকে ক্লাসিক্যাল মার্ক্সিস্ট থিওরি ধরে এগোলে আমারা দেখবো সংবাদপত্রে ভিত্তিকাঠামো যারা নিয়ন্ত্রণ করছে মূলত তারাই উপরিকাঠামোটিও নিয়ন্ত্রণ করছে– যারা অর্থ যোগাচ্ছে তারাই আধেয় নিয়ন্ত্রণ করছে। আমাদের সংবাদপত্রের মূল প্রবণতা তাই ধনিক অভিমুখীনতা'। এর সঙ্গে আছে ভয়াবহ শ্রেণী পক্ষপাত। 'ম্যাসমিডিয়া' তাই আবার কাষ্টমিডিয়াও বটে। এর বাইরে আছে সেন্সরশিপের হ্যাঙওভার- ব্রিটিশ পাকিস্তানের রাজনৈতিক বাস্তবতা পেরিয়ে এলেও প্রতিষ্ঠান হিসেবে এখনো পর্যন্ত বাংলাদেশের কোনো সরকারই সেন্সরশিপের কলোনিয়াল হ্যাঙওভার বা ঔপনিবেশিক ঘোরটি কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়নি। বাংলাদেশের সামরিক শাসনামলে এর এতো বেশি ও ন্যক্কারজনক ব্যবহার হয়েছে যে, সেন্সরশিপের ভূতটি নিজেরই অজান্তে সেলফসেন্সরশিপ হয়ে সাংবাদিকদের ঘাড়ে চেপে বসেছে। প্রশ্নটি তাই ধোঁয়াটে এবং শেষ বিচারে অমীমাংসিতই রয়ে যায় যে, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আসলে কতোটা চর্চিত হতে পারে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আসলে কার স্বাধীনতা? মালিকের? সাংবাদিকের না পাঠকের? জনগণের তথ্য জানার অধিকার নিশ্চিত করার নামে সংবাদপত্র আসলে কার হয়ে কাজ করে? কার স্বাধীনতার চর্চা করে? অনিবার্যভাবে সংবাদপত্রের ওপর রাষ্ট্র পক্ষের হস্তক্ষেপের বিষয়টিও এ আলোচনায় টেনে আনতে হবে। আমরা দেখি, সংবাদপত্রের ওপর চাপ তৈরি করতে রাষ্ট্রপক্ষ নানা কিসিমের 'ম্যাকিয়াভেলিয়ান' কৌশল বেছে নেয়। লাইসেন্স, সরকারি বিজ্ঞাপন, আইন ও আদালত অবমাননাসহ নানা কায়দায় চাপ তৈরির এ

সংবাদপত্রের বিষয়বস্তু কী হবে তা ঠিক করে 'পাঠক তা খাবে কিনা' তার ওপর; দেখতে হবে বিজ্ঞাপনদাতা যেন না চটে। তবে একে আর দশটা কোম্পানির মতো একটি কোম্পানিই মনে করলে ভুল হবে। কারণ এটা সাবান কোম্পানির মতো ভ্যালু-ফ্রি নয়। সাবান কেবল সাবানই বিক্রি করে; কিন্তু সংবাদপত্র তথ্যের সঙ্গে মতাদর্শও বিক্রি করে।

চেষ্টা চলে। আজ যে 'সমকাল' বেরুলো তার লাইসেন্সপ্রাপ্তির দীর্ঘসূত্রিতা নিয়ে যে জটিলতা তৈরি হয়েছিল সে খবর আমরা জানি। আবার রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় যেসব নতুন কাগজ বের করার উদ্যোগ নেয়া হয় সেখানে দেখা যায়, বাজার চাহিদার মাথা খেয়ে অতিউচ্চ মজুরির টোপ দিয়ে অন্য কাগজ থেকে সাংবাদিক ভাগিয়ে আনা হয়। অনেক সময় লক্ষ্য করি, একটি প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করার সর্বান্ত চেষ্টা এবং তার ছাইভস্মের উপর নতুন কাগজের সৌধ নির্মাণের উদ্যোগ। আমার বিবেচনায় এটি একটি অসুস্থকর প্রতিযোগিতা।

কাজেই তাত্ত্বিকভাবে যদিও খুব বড়গলায় এটা প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা হয়ে থাকে যে, গণতান্ত্রিক ও বহুত্ববাদী সমাজে পুঁজির অবাধ প্রবাহ, সুস্থ প্রতিযোগিতা, মুক্ত সমাজ নির্মাণ ও মুক্তবুদ্ধির চর্চা- এসব প্রপঞ্চ একসঙ্গে যায়; কিন্তু চূড়ান্ত বিচারে বুর্জোয়া অর্থ-ব্যবস্থায় সব কিছু ঠিক করে বাজার। সংবাদপত্রের বিষয়বস্তু কী হবে তা ঠিক করে 'পাঠক তা খাবে কিনা' তার ওপর; দেখতে হবে বিজ্ঞাপনদাতা যেন না চটে। তবে একে আর দশটা কোম্পানির মতো একটি কোম্পানিই মনে করলে ভুল হবে। কারণ এটা সাবান কোম্পানির মতো ভ্যালু-ফ্রি নয়। সাবান কেবল সাবানই বিক্রি করে; কিন্তু সংবাদপত্র তথ্যের সঙ্গে মতাদর্শও বিক্রি করে। আবার মত প্রকাশের স্বাধীনতা কেবল সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় পর্যবসিত হয়ে গেলে সমাজের জন্য বিপদ হতে পারে। তথ্য জানার অধিকার তো কেবল পাঠকের হতে পারে না। যারা পাঠ করতে পারে না তাদের কি অধিকার নেই? যারা সংবাদপত্র কিনতে পারে না তারা? তারা কি বাদ যাবে? তা তো হতে পারে না। তথ্য জানার অধিকার কোন পাঠক বা ক্রেতার নয়, এর পরিধি অনেক অনেক বিস্তৃত-এটা প্রত্যেক ব্যক্তি মানুষের অধিকার। এই অধিকার শিক্ষা লাভের অধিকারের মত সার্বজনীন। অধিকারটি নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ; কোনো তথ্য উৎসের প্রকৃতি প্রাপ্যতা বা মূল্যবোধের ওপর নির্ভরশীল নয়- যদিও এটা উৎসের প্রকৃতি প্রাপ্যতা বা মূল্যবোধের ওপরই নির্ভর করে শেষ বিচারে। কোনো ব্যক্তি মানুষও যখন কোনো তথ্য দেয় সে তথ্যেও মতাদর্শ বা মূল্যবোধের মিশেল থাকতে পারে বৈকি।

দুই. কেবল সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নয় দরকার ব্যক্তি মানুষের তথ্য-অধিকার

আলোচনায় সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ফাঁপা ও অন্তঃসারশূন্য বিষয়টি স্পষ্ট করার প্রয়াস পেয়েছি। বোঝা বেশ ভালোভাবেই গেছে যে, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আসলে একটি আড়াল। এই আড়াল দিয়ে সমাজের সব পেশা, লিঙ্গ আর শ্রেণী

মানুষের অধিকারটি যেমন চর্চা করা যায় না তেমনি যায় না বৃহত্তর সমাজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। এই প্রেক্ষাপটে মত প্রকাশের স্বাধীনতার সত্যিকার ও কার্যকর মানে খুঁজতে একে পুন:সজ্ঞায়িত করার গরজ দেখা দেয়। নয়া প্রপঞ্চ হিসেবে 'তথ্য-অধিকার'-এর বিষয়টি উঠে আসে। প্রথমদিকে বিষয়টি কেবল তথ্য জানার বা সরকারি তথ্যে জনগণের প্রবেশাধিকারের বিষয়টি বোঝানো হত। ধীরে ধীরে এর ক্যানভাস বাড়তে থাকে। এতে নয়া মাত্রা যোগ হয়। উদাহরণ হিসেবে সরকারি অফিসারদের কথা বলা যায়, তারা তথ্য জানে কিন্তু তাদের জানানোর অধিকার দেয়া হয়নি। তাই তথ্য জানা এবং জানানোর অধিকার– দুটো দিকে খেয়াল রাখার উপর তাগিদ দেয়া হচ্ছে। তথ্য অধিকার তাই কেবল সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা নয়, নয় কেবল সাংবাদিকের তথ্য প্রাপ্তির স্বাধীনতা, বড় অর্থে এটা আসলে সমাজের স্বাধীনতা, সমাজস্থ মানুষের তথ্য প্রাপ্তির স্বাধীনতা। সাংবাদিক যা করেন তা হলো সমাজের এই স্বাধীনতাকে তার মাধ্যমে চর্চা করেন। সংবাদ মাধ্যম ছাড়াও যে কেউ এর চর্চা করতে পারেন। কারণ, ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা মানুষের স্বাভাবিক অধিকার। একজন কৃষকের উন্নত বীজ বা সারের কিংবা নির্যাতিত নারীর আইনী সহায়তার খবর জানার অধিকার সবই তথ্য অধিকারের আওতায় পড়ে! সমাজের তথ্য ব্যবস্থায় সাংবাদিকের একটি বিশেষ অবস্থান আছে। কারণ, সামাজিক ঘটনার বস্তুনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণ হিসেবে সাংবাদিকরা কমবেশি নিজেদের ভাবমূর্তি তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু গণতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণের জন্য কেবল সাংবাদিক বা সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় যে কাজ হবে না- এ উপলব্ধি আমাদের ভালোভাবেই হয়েছে। তথ্যপ্রাপ্তির বিচিত্র ও বহুধাবিভক্ত চ্যানেল সমাজে থাকতে হবে; এমনকি সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্যও সমাজের সর্বত্র তথ্য-অধিকারের অধিষ্ঠান হওয়া দরকার।

বিষয়টি বোঝাতে নতুন শব্দ নির্মাণ করেছি 'তথ্য অধিকার'–আমার বিবেচনায় যা বোঝায় তথ্য জানানোর, তথ্য উৎপাদনের ও উৎপাদিত তথ্যের বিষয় হওয়ার অধিকার, তথ্য ব্যবহারের এবং অবশ্যই তথ্যের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের অধিকার - কেবল তথ্য জানার অধিকার নয়। বিশদ করলে তথ্য-অধিকারের বিষয়টি দাঁড়ায় মানুষের জানবার অধিকার, জ্ঞান অন্বেষণের অধিকার, খোলামেলা আলোচনা ও মিথষ্ক্রিয়ার অধিকার, জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট যে কোন বার্তা জানার অধিকার, ভাব প্রকাশের অধিকার। মোটকথা 'আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল'– যে ব্যক্তি মানুষ, তার কথা বলতে দেয়ার অধিকার। কথা শোনা ও শোনানোর যে মৌল

আকুতি মানুষের এটা হচ্ছে তার স্বীকৃতি–আধা নয় একেবারেই একশ' ভাগ স্বীকৃতি। বড় দাগে এগুলোকে আমি 'মানবীয় যোগাযোগের মৌলিক অধিকার' বলতে চাই। জাতিসংঘের সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণায় যেমনটি বলা হয়েছে : প্রত্যেকের সমত ধারণ এবং তা প্রকাশের স্বাধীনতা রয়েছে। বাধাহীনভাবে যে কোনো মত গ্রহণ এই অধিকারের অন্তর্ভূক্ত। সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রের ১৯ অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রত্যেকেরই মতামত প্রকাশের অধিকার রয়েছে। বিনা হস্ত ক্ষেপে মতামত পোষণ এবং মাধ্যম ও রাষ্ট্রীয় সীমানা নির্বিশেষে তথ্য ও মতামত সন্ধান, গ্রহণ ও জ্ঞাত করার স্বাধীনতা রয়েছে। ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘের প্রথম সাধারণ অধিবেশনে তথ্য জানার স্বাধীনতাকে মৌলিক মানবাধিকার ও সকল প্রকার স্বাধীনতার কষ্টিপাথর হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ তথ্য অধিকার মানুষের মৌলিক অধিকার হিসেবে জাতিসংঘ কর্তৃক স্বীকৃত। আলোচনার এ পর্যায়ে মনে রাখা দরকার, অধিকার বলতে মানুষের বিকাশের জন্য কতিপয় সুযোগ-সুবিধার দাবিকে বোঝায়, যে দাবির নৈতিক ও আইনগত ভিত্তি থাকে। জন্মলাভ করার পর মানুষের নৈতিক অধিকারের প্রথম স্বীকৃতি দেয় সমাজ। পরে দাবির গুরুত্বের উপর ভিত্তি করে রাষ্ট্র এর আইনি স্বীকৃতি দেয় এবং বলবৎকরণের ব্যবস্থা করে। ফলে তা আইনগত অধিকারে পরিণত হয়। আইনগত ও নৈতিক অধিকারগুলোর মধ্যে সেগুলোই মানবাধিকার হিসেবে চিহ্নিত, যেগুলো পৃথিবীর সকল মানুষ শুধু মানুষ হিসেবে দাবি করতে পারে। এসব অধিকার কোনো দেশ বা কালের সীমানায় আবদ্ধ নয়; এগুলো চিরন্তন ও সর্বজনীন। পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষ এ অধিকার নিয়েই জন্মগ্রহণ করে।

সবচেয়ে ভালভাবে তথ্য অধিকারের বিষয়টি সংজ্ঞায়িত করা যায় নেতিবাচক ডাইকোটমি ব্যবহার করে। যেমন স্বাধীনতা, যখন এটা থাকে না–কেড়ে নেয়া হয়, তখনই ভালভাবে বোঝা যায় স্বাধীনতা আসলে কী। বাংলাদেশে তথ্য অধিকার সংজ্ঞায়িত করা বা এর অন্তর্নিহিত অর্থ বোঝা সহজ, কারণ পদে পদে এ অধিকারটি ক্ষুন্ন করা হয় বা এর স্বীকৃতি দেয়া হয় না। সত্তরের দশকে বিশ্বব্যাপি তথ্য অধিকারের ধারণাটি দানা বাঁধতে থাকে। তখন থেকে এই ধারণা বেশ যুক্তিসঙ্গতভাবেই গড়ে উঠতে থাকে যে গণতন্ত্রের জন্য তথ্য জানা অপরিহার্য। তথ্যের প্রবাহ না থাকলে রাজনীতিতে জনগণের গুণগত অংশগ্রহণ সম্ভব নয়। কিন্তু তথ্য প্রবাহের একপেশে প্রবাহের কারণে দেশের ভেতর এক অঞ্চলের সঙ্গে অন্য অঞ্চলের, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তেমনি উন্নত বিশ্বের সঙ্গে 'সংখ্যাগরিষ্ঠ বিশ্বের'

অধিবাসীদের দুর্লঙ্ঘনীয় তথ্য ফারাক তৈরি হচ্ছে। বিশ্বব্যাপি তথ্যগরিব আর তথ্যধনীর ব্যবধান বাড়ছে বই কমছে না। গণমাধ্যমের গণতান্ত্রায়ন, বিচ্ছিন্নভাবে তাই বিশেষ কোন মানে তৈরি করে না। গণমাধ্যমের গণতান্ত্রায়ণ কেবল তখনই সম্ভব হয়- বৃহত্তর অর্থে যাকে আমরা বলছি সমাজের সর্বত্র তথ্য-অধিকার প্রতিষ্ঠা। কিন্তু তথ্য গোপন রাখা বা কোন তথ্য রেখে-ঢেকে বলার বিষয়টি আজ বাঙালির সংস্কৃতির অংশ হয়ে গেছে। সরকারি অফিসগুলি কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়াই তথ্য প্রদানে অস্বীকৃতি জানায়। অথচ আধুনিক প্রযুক্তির কল্যাণে স্যাটেলাইট ও টেলিকমিউনিকেশনের যে বিস্ময়কর উন্নতি হয়েছে তার ফলে পৃথিবী পরিণত হয়েছে 'ইলেক্ট্রিক গ্লোবাল ভিলেজ' বা সাইবার সিটি' তে। এখানে এক চ্যানেলে তথ্য আটকে গেলে অন্য চ্যানেলে তা ঠিকই বেরিয়ে যায়। দ্রুত পরিবর্তনশীল এই বিশ্বগ্রামে তথ্য গোপন করে রাখা বা আটকে রাখার ধারণা তাই নিতান্ত হাস্যকর। তথ্য আটকে রাখা মানে তথ্যের উপযোগিতা নষ্ট করে দেয়া। কারণ বর্তমান বাস্তবতায় আজকের তথ্য কালকেই তার উপযোগিতা হারিয়ে ফেলে।

বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদে খুব স্পষ্ট করেই তথ্য প্রাপ্তির ও তা প্রকাশের অধিকার দেয়া হয়েছে। আশা করা যায়, একসময় তথ্য প্রাপ্তির স্বাধীনতাকে সাংবিধানিক ও বৈধ কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসা সম্ভব হবে। তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করতে আইন প্রণেতাদের জন্য মোটা দাগে তিনটি করণ-কার্য চিহ্নিত করার প্রয়াস পেয়েছি; আশা করবো, নীতিনির্ধারকগণ কূটতর্কের আড়াল না তুলে এ বিষয়ে কার্যকর উদ্যোগ নেবেন।

এক. সংবিধান সংশোধন করে জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অবাধ অধিকার নিশ্চিত করা।

দুই. দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইনসহ তথ্যপ্রাপ্তির পথে বাধা সৃষ্টি করে এমন সকল আইন সংশোধন বা বাতিল করা।

তিন. একটি কম্প্রিহেনসিভ 'ফ্রিডম অফ ইনফরমেশন অ্যাক্ট' প্রণয়ন করা।

লেখক : শিক্ষক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
সূত্র ঃ সমকাল, ৩১ মে ২০০৫।

নির্বাচনে প্রার্থীদের সম্পর্কে ভোটারদের তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার

ড. বদিউল আলম মজুমদার

জীবনের জন্য যেমন অক্সিজেন প্রয়োজন, তেমনি গণতন্ত্রের জন্য প্রয়োজন তথ্য। অন্যভাবে বলতে গেলে, তথ্য গণতন্ত্রের জীবনী শক্তি। তাই তথ্য প্রাপ্তির অধিকার জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার। নির্বাচনে অংশগ্রহনকারী প্রার্থীদের অতীত এবং বর্তমান সম্পর্কে ভোটারদের জানাও তেমনি একটি অধিকার। আমাদের সংবিধানের ১১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, "প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র," তাই সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা আমাদের সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত। আর প্রার্থীদের সম্পর্কে তথ্য জানলেই জনগণ ভোটাধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে অর্থবহ সিদ্ধান্ত নিতে বা রিয়েল চয়েস (real choice) প্রয়োগ করতে সক্ষম হবে।

ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টের মতে, নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের সম্পর্কে তথ্য জানার অধিকার ভোটারদের বাক স্বাধীনতার অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। আদালত *ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়া বনাম এসোসিয়েসন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্মস* (2002(5)SCC) মামলায় ২০০২ সালে প্রদত্ত এক ঐতিহাসিক রায়ে বলেন:

"নির্বাচনের ক্ষেত্রে বাক-স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের অধিকার মানেই ভোটারদের স্বাধীনভাবে প্রার্থী নির্বাচনের অধিকার। এক্ষেত্রে ভোটাররা মত প্রকাশ করে ভোট প্রদানের মাধ্যমে। একজন ক্ষুদ্র ব্যক্তিও তার প্রার্থী সম্পর্কে পরিপূর্ণ তথ্য জানার অধিকার রাখে, যে প্রার্থী সংসদে তার প্রতিনিধিত্ব করবেন এবং তার সম্পদ ও স্বাধীনতা সুরক্ষায় আইন প্রণয়ন করবেন। যাতে করে সেই ক্ষুদ্র ব্যক্তিটি একজন আইন ভঙ্গকারীকে আইন প্রণেতা হিসেবে নির্বাচন করবেন কিনা তা পূর্বাহ্নেই বিবেচনায় আনতে পারেন।"

আদালত কর্তৃক স্বীকৃত অধিকার

সৌভাগ্যবশতঃ আমাদের আদালতও নির্বাচনের ক্ষেত্রে জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকারের স্বীকৃতি দিয়েছেন। গত ২৪ মে ২০০৫, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের

হাইকোর্ট ডিভিশন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীদের জীবনবৃত্তান্ত ও বিভিন্ন তথ্যাবলী সংগ্রহ সম্পর্কে একটি যুগান্তকারী রায় প্রদান করেন (***আব্দুল মতিন চৌধুরী এবং অন্যান্য বনাম বাংলাদেশ***)। রায়ে নির্বাচন কমিশনকে প্রত্যেক প্রার্থী থেকে মনোনয়নপত্রের সাথে নিম্নলিখিত তথ্যাবলী এফিডেভিট আকারে সংগ্রহ করার এবং এগুলো গণমাধ্যমকে দিয়ে জনগণের মাঝে প্রচার করার নির্দেশ প্রদান করা হয়: (ক) সার্টিফিকেটসহ প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা; (খ) বর্তমানে তাদের বিরুদ্ধে রুজুকৃত ফৌজদারী অপরাধের অভিযোগের তালিকা (যদি থাকে); (গ) অতীত ফৌজদারী মামলার তালিকা ও ফলাফল; (ঘ) প্রার্থীর পেশা; (ঙ) প্রার্থীর আয়ের উৎস এবং উৎস সমূহ ; (চ) অতীতে সংসদ সদস্য হলে জনগণের প্রতি প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পুরণ করার ক্ষেত্রে তার ভূমিকার বর্ণনা; (ছ) প্রার্থী ও প্রার্থীর উপর নির্ভরশীলদের সম্পদ এবং দায়-দেনার বর্ণনা; এবং (জ) ব্যাংক কিংবা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ব্যক্তিগতভাবে বা যৌথভাবে এবং কোম্পানী কর্তৃক – যে কোম্পানীতে প্রার্থী চেয়ারম্যান, নির্বাহী পরিচালক কিংবা পরিচালক – গৃহীত ঋণের পরিমাণ ও বর্ণনা।

একজন ক্ষুদ্র ব্যক্তিও তার প্রার্থী সম্পর্কে পরিপূর্ণ তথ্য জানার অধিকার রাখে, যে প্রার্থী সংসদে তার প্রতিনিধিত্ব করবেন এবং তার সম্পদ ও স্বাধীনতা সুরক্ষায় আইন প্রণয়ন করবেন। যাতে করে সেই ক্ষুদ্র ব্যক্তিটি একজন আইন ভঙ্গকারীকে আইন প্রণেতা হিসেবে নির্বাচন করবেন কিনা তা পূর্বাহ্নেই বিবেচনায় আনতে পারেন।

এসকল তথ্য ভোটারদের মধ্যে বিতরণের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো তাদেরকে তথ্য দিয়ে ক্ষমতায়িত করা। কারণ কোর্টের মতে, প্রার্থীদের সম্পর্কে "জনগণের জানার অধিকার রয়েছে, যা তাদের ভোটাধিকারের অন্তর্ভূক্ত।" কোর্টের নির্দেশ বাস্তবায়ন করা নির্বাচন কমিশনের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য এবং এটি কোর্টের জন্য একটি অগ্নিপরীক্ষাও বটে। কিন্তু দূর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের নির্বাচন কমিশন এই অগ্নিপরীক্ষায় কৃতকার্য হয় নি।

ভারতীয় অভিজ্ঞতা

ভারতের নির্বাচন কমিশনও ২০০২ সালে এমনি একটি অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হয়, যে পরীক্ষায় তাদের সাফল্য প্রশ্নাতীত। ভারতের সুপ্রিম কোর্ট ***ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়া বনাম এসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্মস*** মামলায়, ২০০২ সালের ২রা মে, জাতীয় ও প্রাদেশিক নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের নিকট থেকে নিম্নে বর্ণিত তথ্যসমূহ মনোনয়নপত্রের সাথে এফিডেভিট আকারে সংগ্রহ করে ভোটারদের মধ্যে বিতরণ করার জন্য নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ প্রদান করেন: (ক) প্রার্থী অতীতে কখনো কোনো অপরাধে শাস্তিপ্রাপ্ত বা বেকসুর খালাস হয়েছিলেন কিনা তার বর্ণনা; (খ) প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার পূর্বের ৬ মাসের মধ্যে কোনো অপরাধে অভিযুক্ত হয়েছিলেন কিনা তার বর্ণনা – এমন অপরাধ যার জন্য আদালতে চার্জ গঠন করা হয়েছে এবং যার শাস্তি দুই বছর বা তার বেশি সময়ের জন্য জেলবাস; (গ) প্রার্থী, প্রার্থীর স্বামী-স্ত্রী এবং নির্ভরশীলদের সকল সম্পত্তির (স্থাবর, অস্থাবর এবং ব্যাংক আমানত ইত্যাদি) বিবরণ; (ঘ) সরকারি প্রতিষ্ঠান ও সরকারের নিকট প্রার্থীর সকল দায়-দেনার বিবরণ; এবং (ঙ) প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা।

ভারতীয় নির্বাচনী আইনে নির্বাচন কমিশনকে বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা দেয়া হয়নি। তাই আদালতের রায়কে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ভারতীয় নির্বাচন কমিশন, ১৪ মে ২০০২ তারিখে, আইন মন্ত্রণালয়কে **কণ্ডাক্ট অব ইলেকশন রুলস ১৯৬১**-এ অন্তর্ভূক্ত মনোনয়নপত্র ফর্মে পরিবর্তনের অনুরোধ জানায়। জুন ১৯ তারিখে লিখিত উত্তরে, মন্ত্রণালয় নির্বাচন কমিশনকে জানায় যে, সরকার ৮ই জুলাই এ ব্যাপারে একটি সর্বদলীয় সভা আহবান করেছে এবং কমিশন যেন কোর্টের নিকট থেকে আরো দু' মাসের সময় প্রার্থনা করে। নির্বাচন কমিশন ২১ জুন তারিখে প্রদত্ত উত্তরে বলে যে, কমিশনের সময়ের প্রয়োজন নেই, প্রয়োজনবোধে মন্ত্রণালয় যেন সময়ের প্রার্থনা করে।

আদালতের নির্দেশ যথাসময়ে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের নিষ্ক্রিয়তার কারণে নির্বাচন কমিশন ২৮ জুন স্বপ্রণোদিত হয়ে ৫ পৃষ্ঠার একটি **নির্দেশ** জারি করে, যার মধ্যে নিম্নলিখিত নির্দেশনাবলী অন্তর্ভূক্ত ছিল: (১) জাতীয় এবং প্রাদেশিক নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রার্থীকে কোর্টের নির্দেশিত পাঁচটি বিষয়ে যথাযথ

এবং সম্পূর্ণ তথ্য সংযুক্ত ছকে এফিডেভিট আকারে মনোনয়নপত্রের সাথে জমা দিতে হবে। (২) এফিডেভিটটি প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট অথবা নোটারী পাবলিকের সামনে সম্পাদন করতে হবে। (৩) এফিডেভিট জমা না দিলে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ লঙ্ঘনের কারণে রিটার্নিং অফিসার মনোনয়নপত্র বাতিল করবেন। (৪) বাছাইয়ের সময় তাৎক্ষনিক তদন্তের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় দলিলের ভিত্তিতে এফিডেভিটে অসত্য বা অসম্পূর্ণ অথবা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য গোপনের কারণে রিটার্নিং অফিসার মনোনয়নপত্র বাতিল করবেন। এফিডেভিটে ভুল তথ্য প্রদান করলে ভারতীয় দন্ডবিধির অধীনে সরকারি কর্মকর্তার কাছে ভুল তথ্য প্রদান ও সত্য গোপনের অভিযোগেও প্রার্থী অপরাধী হবেন। (৫) সংশ্লিষ্টদের কাছে সহজপ্রাপ্য করার লক্ষ্যে রিটার্নিং অফিসার এফিডেভিটের কপি নোটিশ বোর্ডে টানিয়ে দেবেন এবং প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী ও গণমাধ্যমের কাছে ব্যাপকভাবে বিতরণ করবেন। (৬) প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থীরাও বিরোধী হলফনামা (counter affidavit) দাখিল করতে পারবেন। পরবর্তিতে সুপ্রিম কোর্টের ২০০৩ সালের রায়ের প্রেক্ষিতে এই নির্দেশনায় অবশ্য কিছুটা পরিবর্তন আনা হয়।

ভারত সরকার পরবর্তীতে **গনপ্রতিনিধিত্ব আইন** সংশোধনের মাধ্যমে আদালতের রায় অকার্যকর করার উদ্যোগ গ্রহন করে। এর বিরুদ্ধে এসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্মস (এডিআর) ও পিপলস ইউনিয়ন ফর সিভিল লিবার্টিস (পিইউসিএল) আদালতের শরনাপন্ন হয়। ভারতীয় সুপ্রিম কোর্ট ২০০৩ সালে সরকারের এ উদ্যোগকে সংবিধান বহির্ভূত বলে রায় প্রদান করেন (2003(4)SCC.399) এবং পূর্বের (২০০২ সালের) রায় বহাল রাখেন। আদালত বলিষ্ঠভাবে বলেন, রাষ্ট্রের সাথে জড়িত কাউকে কোর্টের আদেশ অমান্য করার জন্য বলার ক্ষমতা আইনসভার নেই এবং আদালতের রায়কে চূড়ান্ত বলে ঘোষনা করেন।

গত লোকসভা নির্বাচনের সময় নির্বাচন কমিশন সকল হলফনামা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রচার করে। সর্বোপরি কমিশন তার নির্দেশনাগুলো কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করে। যেমন, ২০০৪ সালের রাজ্যসভা নির্বাচনে এফিডেভিট সংযুক্ত না হওয়ার কারণে উত্তর প্রদেশের দুই জন কংগ্রেস প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়। ফলে বিরোধী বিজেপি প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন।

আমাদের নির্বাচন কমিশনের ব্যর্থতা

যদিও সুপ্রিম কোর্টের রায়ে শাস্তির কোনো বিধান রাখা হয়নি, ভারতের নির্বাচন কমিশন এফিডেভিট জমা না দেয়ার কারণে মনোনয়ন বাতিলের নির্দেশ প্রদান করে। এছাড়াও কমিশন নিজের থেকেই হলফনামা দাখিলের বিধান করে। কমিশন তার এ সাহসী ও উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণের জন্য সুপ্রিম কোর্টের রায়ের উদ্ধৃতি দেয়। কোর্ট তার ২০০২ সালের রায়ে বলেন যে, আইন প্রণয়নের সময় সব ধরনের সম্ভাব্য পরিস্থিতি সম্পর্কে অনুমান করা দুরূহ বিধায় ভারতীয় সংবিধানের ৩২৪ অনুচ্ছেদের অধীনে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্বাচন কমিশনকে সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠানের স্বার্থে পরিপূর্ণ (plenary) এবং পরিপূরক (residuary) ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। তাই আইন যেখানে অসম্পূর্ণ, নির্বাচন কমিশন নির্দেশের মাধ্যমে সেই অসম্পূর্ণতা দূর করতে পারে ।

ভারতের মত আমাদের সংবিধানের ১১৯ অনুচ্ছেদেও নির্বাচন কমিশনকে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের লক্ষ্যে পূর্নাঙ্গ ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। ***আলতাফ হোসেন বনাম আবুল কাসেম*** মামলায় (৪৫ডিএলআর(এডি)(১৯৯৩)) বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপীল বিভাগ রায় দেন যে, সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন নিশ্চিত করার স্বার্থে সংবিধানের "তত্ত্বাবধান, নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ" ক্ষমতার অধীনে আইনের বিধানের সাথে সংযোজন (supplement) করার এখতিয়ার নির্বাচন কমিশনকে প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও আমাদের **গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২**-এর অধীনে নির্বাচন কমিশনকে বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, যা ভারতীয় নির্বাচন কমিশনের নেই।

আমাদের সাম্প্রতিক হাইকোর্টের রায়ও ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টের ২০০২ সালের রায়ের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ এবং আমাদের সংবিধানের ১১১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আদালতের রায় আইনের সমতুল্য। কিন্তু হাইকোর্টের উপরিউক্ত রায় বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আমাদের নির্বাচন কমিশন অদ্যাবধি তেমন দৃঢ়তা প্রদর্শন করেননি। বরং এক্ষেত্রে কমিশনের উদ্যোগ অত্যন্ত ক্ষীণ। উদাহরণস্বরূপ, গত ১৮ই জুন সুনামগঞ্জ-৩ আসনের উপনির্বাচনে রিটার্নিং অফিসার ও সুনামগঞ্জের জেলা প্রশাসকের কাছে প্রেরিত এক **বিশেষ পরিপত্রে** বলা হয়: "জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীদের বিভিন্ন তথ্যাবলী প্রদান সম্পর্কে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট

বিভাগে দাখিলকৃত রিট পিটিশন নং-২৫৬১/২০০৫-এর প্রেক্ষিতে মাননীয় আদালত ২৪মে ২০০৫ তারিখে কতিপয় নির্দেশ প্রদান করেছেন। মাননীয় আদালতের রায়ের কপি **পরিশিষ্ট-ক-তে** সংযুক্ত করা হল। মাননীয় আদালতের আদেশ অনুসারে প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থীগণ যে হলফনামায় বিভিন্ন তথ্যাদি রিটার্নিং অফিসারকে প্রদান করবেন তা **পরিশিষ্ট-খ-তে** সংযুক্ত করা হল। মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় প্রার্থীগণ নির্ধারিত হলফনামায় রিটার্নিং অফিসারের নিকট বিভিন্ন তথ্যাদি দাখিল করবেন। এ সকল তথ্যাদি ভোটারদের জ্ঞাতার্থে বিভিন্ন গণমাধ্যমে রিটার্নিং অফিসারকে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ... বর্ণিত অবস্থায় মাননীয় আদালতের আদেশ কার্যকর করার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হল।"

আমরা বিশ্বাস করি, হাইকোর্টের রায় আমাদের রাজনীতিতে দূর্বৃত্তায়ন রোধের মাধ্যমে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যানে নিবেদিত ব্যক্তিদের রাষ্ট্রক্ষমতায় যাওয়ার সুযোগ করে দেবে। ফলে দেশে সত্যিকারের গণতান্ত্রিক তথা জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এবং আমাদের সকলের জন্য একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনার দ্বার উম্মোচিত হবে।

সুনামগঞ্জ উপনির্বাচনের পর ফরিদপুর, দিনাজপুর ও মানিকগঞ্জ জেলায় আরো তিনটি উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এসকল উপনির্বাচনেও নির্বাচন কমিশন একই ধরনের প্রজ্ঞাপন জারি করে। তবে ভারতীয় নির্বাচন কমিশনের **নির্দেশের** তুলনায় আমাদের কমিশনের **অনুরোধ** বড়জোর দূর্বল ও অস্পষ্ট। ফলে অনেকটা আনুষ্ঠানিকতার খাতিরেই প্রার্থীগণ মনোনয়নপত্রের সাথে এফিডেভিট জমা দেন। কিন্তু দূর্ভাগ্যবশতঃ নির্বাচন কমিশন এফিডেভিটগুলো প্রকাশ করে নি। এ ব্যাপারে স্বেচ্ছাব্রতী নাগরিক আন্দোলন 'সুজন'-এর পক্ষ থেকে লিখিত আবেদনের জবাব দেয়ার প্রয়োজনীয়তাও নির্বাচন কমিশন কিংবা সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারগণ অনুভব করে নি। তবে নির্বাচন কমিশন এফিডেভিটগুলোর একটি সারাংশ উপরিউক্ত চারটি উপনির্বাচনের প্রাক্কালে প্রকাশ করে। প্রকাশিত সারাংশ থেকেই সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, অনেক প্রার্থী তথ্য গোপন করেছেন এবং বিভ্রান্তিমূলক

তথ্য দিয়েছেন। কিন্তু কমিশন এদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয়েছে। এব্যাপারে আমরা কয়েকজন নাগরিক মাননীয় হাইকোর্টে আরেকটি রিট দায়ের করেছি, যা বর্তমানে শুনানির অপেক্ষায় আছে।

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২-এর ৪৪এএ ধারা অনুযায়ীও প্রার্থীদের তাদের নির্বাচনী ব্যয়ের উৎস, সম্পদ, দায়-দেনা, বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাব এবং আয়কর রিটার্নের কপি রিটার্নিং অফিসারের কাছে জমা দেয়া বাধ্যতামূলক। 'সুজন'-এর পক্ষ থেকে ফি দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে আবেদন করেও এসকল তথ্য পাওয়া যায় নি, যদিও নির্বাচন কমিশন আইনগতভাবে এগুলো দিতে বাধ্য। তাই এটি সুস্পষ্ট যে, কমিশন নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের সম্পর্কে জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার সমুন্নত রাখতে ব্যর্থ হয়েছে।

জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিয়ে দূরভিসন্ধি

আমাদের নির্বাচন কমিশন আদালতের রায় পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়নেই শুধু ব্যর্থ হয়নি, নির্বাচনে অংশগ্রহনকারী প্রার্থীদের সম্পর্কে তথ্য জানার ভোটারদের অধিকারকে পদদলিত করার একটি অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছেন বলে আশঙ্কা হয়। আমাদের মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার কিছুদিন আগে দাবি করছেন যে, যেহেতু হাইকোর্টের রায়ে কোন শাস্তির বিধান নেই, তাই এটি মানার কোন বাধ্যবাধকতাও নেই। কারণ রায়টি ডিরেক্টরি (directory), ম্যান্ডেটরি (mandatory) নয়।

অভিজ্ঞদের মতে, মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনারের এ দাবি অনাকাঙ্খিত। কারণ আইনের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র আদালতের রায় ঐচ্ছিক বা ডিরেক্টরী হতে পারে। অর্থাৎ আইনের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে যদি 'shall' শব্দটি ব্যবহার এবং শাস্তির বিধান রাখা হয়, তাহলেই সে ব্যাখ্যা মানা সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য বাধ্যতামূলক (mandatory)। আদালতের অন্য সকল রায় মানাই সকলের জন্য বাধ্যতামূলক। এছাড়া রায় মানা বাধ্যতামূলক না হলে আদালতের প্রয়োজনীয়তাই বা কী? তাই আমাদের মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার আদালতের রায়ের অপব্যাখ্যা দেয়ার অপপ্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছেন বলে মনে হয়, যা একজন বিজ্ঞ বিচারপতির কাছ থেকে কোনভাবেই আশা করা যায় না।

নির্বাচনে প্রার্থীদের সম্পর্কে ভোটারদের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার প্রতিষ্ঠায় মাননীয় হাইকোর্টের রায়কে ভন্ডুল করার আরেকটি দুরভিসন্ধি বর্তমানে চলছে। আদালতের রায় প্রদানের দশ মাসের বেশী সময়ের পর মোহাম্মদ আবু সাফা নামে জনৈক ব্যক্তিকে সম্প্রতি সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগ, এর বিরুদ্ধে আপিল করার অনুমতি দেন, যদিও জনাব সাফা কোনভাবেই এ মামলার পক্ষ বা এর সাথে জড়িত ছিলেন না। এছাড়াও আদালতের নিয়ম অনুযায়ী, এ ধরনের সিভিল মামলার রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করার সময়সীমা ৬০ দিন। সর্বোপরি এ আপিলের ব্যাপারে মামলার মূল বাদীদেরকে কিংবা তাদের উকিলদের বরাবরে কোন নোটিশ জারি করা হয় নি, যা করা বাধ্যতামূলক। পুরো বিষয়টিই সম্পূর্ণ গোপনীয়তার সাথে সম্পন্ন করা হয়েছে। অনেকের কাছেই তাই বিষয়টি অস্বাভাবিক এবং অবিশ্বাস্য।

প্রয়োজন নাগরিকের সক্রিয়তা এবং কমিশনের আন্তরিকতা

নির্বাচনে প্রার্থীদের সম্পর্কে ভোটারদের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ভারতীয় নাগরিকদের সোচ্চার কণ্ঠ ও সক্রিয়তা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। সুপ্রিম কোর্টের রায় প্রকাশের পরপরই 'ইলেকশন ওয়াচ' নামে বহু ব্যক্তি ও বেসরকারী সংগঠনের সমন্বয়ে সারা দেশে একটি নাগরিক উদ্যোগ গড়ে ওঠে। 'ইলেকশন ওয়াচ' গত লোকসভা নির্বাচনের এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রদেশে বিধান সভা নির্বাচনের সময়ে নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রচারিত প্রার্থীদের এফিডেভিট থেকে তথ্য দিয়ে সেগুলো ভোটারদের জ্ঞাতার্থে প্রচার করে। এ সকল তথ্য থেকে বর্তমানে ভারতীয় লোকসভার ১২৫ জনকে দাগী সাংসদ বলে চিহ্নিত করা হয়, যাদের সদস্যপদ খারিজ করার জন্য ইতোমধ্যে একটি আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছে।

ভারতের অনেক চিন্তাশীল নাগরিক 'ইলেকশন ওয়াচে'র সাথে জড়িত হন এবং ভোটারদের তথ্যভিত্তিক ক্ষমতায়নের আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। উদাহরণসরূপ, ভারতের সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি এবং মানবাধিকার কমিশন ও সংবিধান পর্যালোচনা কমিশনের সাবেক প্রধান এম.এন, ভেঙ্কটাচালিয়া এই আন্দোলনের সাথে যুক্ত আছেন। তিনি কর্ণাটক রাজ্যের 'ইলেকশন ওয়াচে'র প্রধান। ভারতীয় গণমাধ্যমও এ কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখে। নাগরিক সমাজ

ও গণমাধ্যমের চাপের ফলে ভারতীয় লোকসভায় সম্প্রতি একটি নির্বাচনী সংস্কার সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটি গঠন করা হয়েছে।

ভারতীয় নির্বাচন কমিশন নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদেরকে শুধু তথ্য দিতেই বাধ্য করেনি, সংগৃহিত সকল তথ্য তারা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রকাশও করেছে। এছাড়াও কমিশন 'ইলেকশন ওয়াচ' এবং অন্যান্য নাগরিক সংগঠনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছে। কমিশন সম্প্রতি ভারতীয় রাজনীতিকে কলুষমুক্ত করতে ২২-দফা প্রস্তাব প্রদান করেছে, যা নিয়ে বর্তমানে রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে আলাপ-আলোচনা চলছে।

পক্ষান্তরে, গত বৎসর মে মাসের হাইকোর্টের রায়ের পরও জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করতে আমাদের নাগরিক সমাজের থেকে কোন উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায় নি। একমাত্র 'সুজন'ই গত কয়েকটি উপনির্বাচনে জনগণ যাতে জেনে-শুনে-বুঝে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে সে লক্ষ্যে উদ্যোগী ভুমিকা রেখেছে। সহায়তার পরিবর্তে নির্বাচন কমিশন থেকে এ কাজে শুধু প্রতিবন্ধকতারই সৃষ্টি করা হয়েছে। কিছু বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা ছাড়া আমাদের গণমাধ্যমও এব্যাপারে নির্লিপ্ত ভুমিকা পালন করেছে।

আমরা আশা করি যে, আমাদের সংবাদ মাধ্যম ভবিষ্যতে আরো সক্রিয় ভুমিকা রাখবেন এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের সম্পর্কে অনুসন্ধানি রিপোর্ট প্রকাশ করবেন। আমাদের সচেতন নাগরিক সমাজও একাজে এগিয়ে আসবেন। হাইকোর্টের নির্দেশাবলী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন ভবিষ্যতে আরো দৃঢ়তা ও অনমনীয়তা প্রদর্শন করবেন এবং সুস্পষ্ট নির্দেশ জারি করবেন। কারণ প্রার্থীদের সম্পর্কে তথ্য পাওয়া ভোটারদের সাংবিধানিক অধিকার, নিতান্ত আলংকারিক বিষয় নয়। আমরা বিশ্বাস করি, হাইকোর্টের রায় আমাদের রাজনীতিতে দূর্বৃত্তায়ন রোধের মাধ্যমে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যানে নিবেদিত ব্যক্তিদের রাষ্ট্রক্ষমতায় যাওয়ার সুযোগ করে দেবে। ফলে দেশে সত্যিকারের গণতান্ত্রিক তথা *জনগণের শাসন* প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এবং আমাদের সকলের জন্য একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনার দ্বার উম্মোচিত হবে।

লেখক : সম্পাদক, সুজন এবং গ্লোবাল ভাইস প্রেসিডেন্ট ও কান্ট্রি ডিরেক্টর, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ।

যোগাযোগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে

সানজিদা সোবহান

তথ্য অধিকার মানবাধিকার; মানুষের এই অধিকার নিশ্চিত করার জন্য বহু রাষ্ট্রেই 'তথ্য অধিকার' আইন আছে। অনেক দেশে এ বিষয়ে আইন না থাকলেও সাংবিধানিকভাবে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তথ্য অধিকারকে অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনটি সর্বাপেক্ষা পুরনো। এছাড়া অস্ট্রেলিয়ায় ফ্রিডম অব ইনফরমেশন অ্যাক্ট ১৯৮৩ এবং কানাডায় অ্যাকসেস টু ইনফরমেশন অ্যাক্ট ১৯৮৩ কেন্দ্রীয় পর্যায়ে প্রচলিত আছে। পাশাপাশি এই দুটো দেশেরই বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য এবং অঞ্চলের জন্য আলাদা আইন আছে তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে জনগণের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য।

দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে ভারতের মতো বিশাল গণতান্ত্রিক দেশে এ বছরই (২০০৫) তথ্য অধিকার আইনটি কার্যকর করা হয়, যদিও আইনটি প্রণয়ন করা হয়েছিল ২০০২ সালে। তবে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে জনগণকে তাদের জীবনযাপনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ও প্রয়োজনীয় বিষয় জানার জন্য সহায়ক আইনের প্রচলন হয়েছে বেশ আগেই।

বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদে চিন্তা, বিবেক ও বাক স্বাধীনতাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। সংবিধানে সরাসরি তথ্য স্বাধীনতাকে অধিকার হিসেবে উল্লেখ করা হয়নি। তবে চিন্তা, বিবেক, বাক এবং সংবাদ ক্ষেত্রে স্বাধীনতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে প্রচ্ছন্নভাবে তথ্যের ওপর জনগণের জানার অধিকারকে প্রকারন্তরে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। তথ্য যদি ব্যক্তির জানার অধিকারকে প্রকারন্তরে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। তথ্য যদি ব্যক্তির অজানা থাকে তাহলে তার চিন্তা, বিবেক, বাক স্বাধীনতার প্রকাশ ঘটানো কোনক্রমেই সম্ভব নয়। বাংলাদেশের জন্য আশাব্যঞ্জক বিষয় হচ্ছে 'তথ্য অধিকার ২০০২' বিষয়ে একটি খসড়া আইন ইতিমধ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে। তবে এ খসড়া আইনটি প্রণয়নে সুশীল সমাজের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে পর্যাপ্ত আলোচনা হয়নি বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। বাংলাদেশে তথ্য পাওয়াটাকে যতটা না অধিকার হিসেবে দেখা হয়, তার থেকে বেশি তথ্যের প্রবেশাধিকারকে 'উন্নয়ণের হাতিয়ার ' হিসেবে দেখা হয়ে থাকে। তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে এক ধরনের গোপনীয়তার সংস্কৃতি বাংলাদেশ উপনিবেশ আমল থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে।

স্বাধীনভাবে অভিব্যক্তি বা মতামত প্রকাশের জন্য দুটি বিষয় দরকার। প্রথমত, ব্যক্তি যে বিষয়ে তার মতামত প্রকাশ করতে চায়, সে বিষয়ে তার পরিষ্কার ধারণা না থাকলে সে পরিপূর্ণভাবে নিজের ভাব প্রকাশ করতে পারে না। এ কারণেই ব্যক্তি তথা জনগণের জানার প্রয়োজন আছে, আর সে কারণেই প্রয়োজন সহজ ও স্বাধীনভাবে তথ্য পাওয়ার ব্যবস্থা।

মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা ও যোগাযোগের স্বাধীনতা একটি অপরটির পরিপূরক। একটি গণতান্ত্রিক দেশে দুটিই থাকা কাম্য। অন্যান্য সম্পদের মতো তথ্য একটি বিশেষ সম্পদ। এর যত বেশী ব্যবহার হবে, তথ্য সংগ্রহ ও এর আদান-প্রদান যত বেশী হবে, দেশ ততই সমৃদ্ধি অর্জন করবে।

দ্বিতীয়ত, তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার জন্য যোগাযোগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। এটি হতে হবে দ্বিমূখি। যোগাযোগের স্বাধীনতা যে ব্যক্তি তথ্য জানতে চায় তার ওপর প্রযোজ্য হবে এবং যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তথ্য দেবে তার স্বাধীনতা থাকবে তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে। মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা ও যোগাযোগের স্বাধীনতা একটি অপরটির পরিপূরক। একটি গণতান্ত্রিক দেশে দুটিই থাকা কাম্য। অন্যান্য সম্পদের মতো তথ্য একটি বিশেষ সম্পদ। এর যত বেশী ব্যবহার হবে, তথ্য সংগ্রহ ও এর আদান-প্রদান যত বেশী হবে, দেশ ততই সমৃদ্ধি অর্জন করবে।

বহুদলীয় গণতন্ত্রের মতোই পরমতসহিষ্ণু বহুত্ববাদী গণমাধ্যম ব্যবস্থা প্রচলন থাকা দরকার। কিছু ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছে গণমাধ্যমের বিভিন্ন মাধ্যম কেন্দ্রীভূত থাকলে যোগাযোগের ব্যবস্থাসমূহ অচল ও অকার্যকর হয়ে পড়ে। সত্য ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ বা তথ্য প্রচারের ক্ষেত্রে গণমাধ্যমগুলার স্বাধীনতা থাকা দরকার। না হলে জনগণ প্রকৃত তথ্য থেকে বঞ্চিত হবে, যা উন্নয়নের জন্য মোটেই সহায়ক নয়। গণমাধ্যম পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চালু থাকলে গণমাধ্যমগুলোর মধ্যে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রচারের ক্ষেত্রে সুস্থ প্রতিযোগিতা থাকে। তথ্য প্রচারের সুস্থ প্রতিযোগিতা শুধু তথ্যভান্ডার নয়, দেশকে সমৃদ্ধিশালী করে উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিতে সাহায্য করে।

লেখক : কর্মসূচি ব্যবস্থাপক, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন।

অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট বাংলাদেশের জনগণ তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত

তছলিমা খাতুন

২০০৪ সালের শেষ দিকে বাংলাদেশ সরকার বিমানবাহিনীর জন্য একটি এফ-৭ যুদ্ধ বিমান ক্রয় করে। এ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে গিয়েছিলেন দৈনিক প্রথম আলোর চিফ রিপোর্টার প্রণব সাহা। কিন্তু সেখানে তাকে কোন তথ্য দেয়া হয়নি। মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলেন, সাংবাদিকদের তথ্য দেয়ার ক্ষেত্রে আইনি নিষেধ রয়েছে। ঠিক একইভাবে ২০০৫ সালে কক্সবাজারে রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরে গিয়ে কোন তথ্য পাননি দৈনিক ইত্তেফাকের মহিলা অঙ্গন পাতার সম্পাদক ফরিদা ইয়াসমিন। সেখানকার কর্মকর্তারা তাকে জানান, রোহিঙ্গাদের বিষয়ে তথ্য দিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের নিষেধ রয়েছে। সাংবাদিক প্রণব সাহা ও ফরিদা ইয়াসমিন বলেন, "যে আইন দেখিয়ে আমাদের দেশের সাংবাদিকদের তথ্য না দিয়ে ফিরিয়ে দেয়া হয়; তার নাম 'অফিসিয়াল সিক্রেটস এ্যাক্ট'। শুধু সরকারি প্রতিষ্ঠান নয়, অনেক বেসরকারি প্রতিষ্ঠনের কর্মকর্তাও এ আইনের কথা বলে সাংবাদিকদের তথ্য দিতে গড়িমসি করেন।" দু' জনেরই অভিযোগ, ইদানিং সাধারণ বিষয়ে তথ্য দিতেও সরকারি কর্মকর্তারা অস্বীকৃতি জানাচ্ছেন।

দৃশ্যত তথ্য প্রদানে সরকারি কর্মকর্তাদের অস্বীকৃতি এদেশের জনগণের তথ্য জানার অধিকারকে ক্ষুন্ন করছে। ভুক্তভোগী সাংবাদিকরা জানান, দেশে দু'ভাবে তথ্য সংগ্রহ বাধাগ্রস্ত হয়। এর প্রথমটি আইনগত ও দ্বিতীয়টি মনস্তাত্ত্বিক। আইনগত বাধার ক্ষেত্রে সবচেয়ে আলোচিত আইনটি হলো, 'অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট'। ১৯২৩ সালে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার এদেশের প্রতিরক্ষা ও সামরিক গোপন তথ্য যাতে শত্রুপক্ষের কাছে না যায়, সে জন্য ওই আইন তৈরি ও কার্যকর করে। ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটলেও 'অফিসিয়াল

সিক্রেটস অ্যাক্ট' বহাল থাকে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ড. সাখাওয়াত আলী খান বলেন, অফিসিয়াল সিক্রেটর্স অ্যাক্টের দোহাই দিয়ে অনেক সাধারণ তথ্য সাংবাদিকদের দেয়া হয় না। তাছাড়া এ আইনে স্পষ্ট করে বলা নেই, কোন তথ্য প্রকাশ করা যাবে–আর কোনটি যাবে না। এ সুযোগটি গ্রহণ করেন অধিকাংশ সরকারি কর্মকর্তা।

আইনগত বাধার ক্ষেত্রে সবচেয়ে আলোচিত আইনটি হলো, 'অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট'। ১৯২৩ সালে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার এদেশের প্রতিরক্ষা ও সামরিক গোপন তথ্য যাতে শত্রুপক্ষের কাছে না যায়, সে জন্য ওই আইন তৈরি ও কার্যকর করে। ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটলেও 'অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট' বহাল থাকে।

২০০৫ সালের ৫ সেপ্টেম্বর বেসরকারী সংস্থা 'মানুষের জন্য' আয়োজিত 'বাংলাদেশ তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার: চ্যালেঞ্জ ও বাস্তবতা' শীর্ষক সেমিনারে সানজিদা সোবহান এবং ফারজানা নাঈম তাদের উপস্থাপিত প্রবন্ধে বলেন, 'অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্টের অনেকগুলো ধারা তথ্যপ্রাপ্তিতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এর মধ্যে রয়েছে, ১৯২৩ সালের আইনের ধারা-৫, সরকারী কর্মচারী (আচরণ) বিধির (১৯৭৯) ধারা-১৯, দি রুলস অফ বিজনেসের (১৯৯৬) সেকশন-২৮(১), (৩), (৪) এবং সাক্ষ্য আইনের (১৯৭২) সেকশন ১২৩, ১২৪ ও ১২৫। এছাড়া দন্ডবিধির সেকশন ৪৯৯, ফৌজদারি কার্যবিধি ১৮৯৮-এর সেকশন ৯৯ এবং বর্তমান টেলিকম অ্যাক্টের সংশোধনীও অনেক সময় জনগণ ও সাংবাদিকদের তথ্যপ্রাপ্তিতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।' প্রবন্ধে তারা উল্লেখ করেন, আদালতে তথ্য গোপন রাখার যে চর্চা চালু হয়েছে; তা অনেক ক্ষেত্রেই সীমা ছাড়িয়ে যায়। অনেক সময় অনেক সাধারণ তথ্যও জানানোর বিষয় সংশ্লিষ্ট

কর্মকর্তারা আমলে নেন না।

১৯৪৮ সালের জাতিসংঘ মানবাধিকার সনদের ১৯ নম্বর ধারায় উল্লেখ রয়েছে, 'প্রত্যেকেরই মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা রয়েছে। বিনা হস্তক্ষেপে মতামত পোষণ এবং যে কোন মাধ্যমে ও রাষ্ট্রীয় সীমানা নির্বিশেষে তথ্য ও মতামত সন্ধান, গ্রহণ ও জানানোর স্বাধীনতা এ অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।' বাংলাদেশ এ সনদ অনুমোদন করেছে। তাছাড়া ২০০০ সালের ৬ সেপ্টেম্বর সরকার 'নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার' বিষয়ক ১৯৬৬ সালের আন্তর্জাতিক চুক্তিতে অনুস্বাক্ষর করে। এ চুক্তি অনুযায়ী সরকার নাগরিকদের গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার সাপেক্ষে সব ধরনের তথ্য জনসাধারণের সামনে উন্মুক্ত রাখতে বাধ্য। কিন্তু এতকিছুর পরও দূর হয়নি তথ্য গোপন করার চেষ্টা।

প্রবীণ সাংবাদিক ও দৈনিক আমার দেশের উপদেষ্টা সম্পাদক আতাউস সামাদ মনে করেন, সাংবাদিকরা যদি সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করতে চান তাহলে কোন প্রতিবন্ধকতাই ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। তিনি বলেন, সামরিক শাসক আইয়ুব খানের সেন্সরশিপ, ইয়াহিয়া খানের চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধ ও এরশাদের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে আমাদের কলম ছিল সোচ্চার। কোন হুমকি বা নির্যাতনে আমরা দমে যাইনি। তবে বর্তমানে ত্রুটিপূর্ণ তথ্য সংরক্ষণ পদ্ধতি ও সরকারি কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতার অভাবের কারণে রিপোর্টাররা অনেক চেষ্টা করেও সব তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন না।

আরেক প্রবীণ সাংবাদিক ফজলুল করিমও মনে করেন, দেশের প্রত্যেক নাগরিকের তথ্য জানার অধিকার আছে। দেশের মানুষ যদি সব তথ্য জানতে পারে তবে সে বিপদমুক্ত থাকবে। তিনি বলেন, দেশে বর্তমানে তথ্য অধিকার বলে কিছু নেই। তথ্য থেকে দূরে রাখাই ক্ষমতাসীনদের লক্ষ্য। তথ্যপ্রাপ্তির ব্যাপারে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেন তিনি।

তবে দৈনিক মানবজমিন সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরী মনে করেন, তথ্যপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে পরিস্থিতির নাটকীয় অগ্রগতি হয়েছে। বছর ১৫ আগে স্বৈরশাসনামলে তথ্যপ্রাপ্তির কোন সুযোগ ছিল না। কিন্তু দেশের প্রিন্ট এবং ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া এখন অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অন্তরায় হচ্ছে সেলফ সেন্সরশিপ। তিনি বলেন, বাস্তব পরিস্থিতি হলো জনগণের তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার সংক্রান্ত কোন আইনি কাঠামো এখনও আমাদের দেশে গড়ে ওঠেনি। তবে এর প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া জরুরী। সবার আগে অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট বাতিল করা প্রয়োজন। তার মতে, এ আইন বাতিলে সরকারকে বাধ্য করতে সাংবাদিক সমাজকে আরও সোচ্চার হতে হবে।

দেশে বর্তমানে তথ্য অধিকার বলে কিছু নেই। তথ্য থেকে দূরে রাখাই ক্ষমতাসীনদের লক্ষ্য। তথ্যপ্রাপ্তির ব্যাপারে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা প্রয়োজন

আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতে 'তথ্য জানার আইন' পাস হয়েছে। ঠিক সে আইনের আদলে একটি আইন তৈরী করতে আইন কমিশন ২০০২ একটি খসড়া কার্যপত্র প্রণয়ন করে। আইন কমিশনের কর্মকর্তারা বলেন, খসড়া কার্যপত্রটি ফাইলবন্দি হয়ে পড়ে আছে।

সাংবাদিক আতাউস সামাদ অবশ্য মনে করেন, শুধু অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট বাতিল নয়; আমাদের কাজের মানও উন্নত করা প্রয়োজন। কারণ অনেক সময় বিজ্ঞাপন সঠিক তথ্য প্রচারে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আবার অনেক সময় সংবাদপত্রে ভুল রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়। এ ধরনের ঘটনা সংবাদপত্রের বিশ্বাসযোগ্যতার জন্য খুব ক্ষতিকর। তার মতে, সাংবাদিকদের তথ্য পাওয়ার জন্য দেশে একটি যথার্থ আইন হওয়া প্রয়োজন।

সাংবাদিক প্রণব সাহাও মনে করেন, তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করতে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। নীতিনির্ধারণে যারা থাকেন তাদের বোঝানো দরকার তথ্যপ্রবাহ অবাধ হলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা সহজ হয়।

জনগণের তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করতে চলতি বছরের মে মাসে হাইকোর্ট একটি রায় প্রদান করেন। ওই রায়ে হাইকোর্ট আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রত্যেক প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা, ফৌজদারি অপরাধের তালিকা (যদি থাকে), প্রার্থীর পেশা, আয়ের উৎস ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে গণমাধ্যমে দেয়ার জন্য নির্বাচন কমিশনের প্রতি নির্দেশ জারি করেন। সাংবাদিক ফরিদা ইয়াসমিন বলেন, তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার অর্জনের ক্ষেত্রে এ রায় নি:সন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। আর জনগণের তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করতে সরকারকেই উদ্যোগ নিতে হবে।

সূত্র : সংবাদ, জুন ১৮,২০০৬।

তথ্যের অধিকার একটি মানবাধিকার

জাকির হোসেন

'তথ্যের অধিকার একটি মানবাধিকার'। সম্প্রতি পৃথিবীতে এই অধিকার নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হচ্ছে। জাতিসংঘ, কমনওয়েলথ-এর মত আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে দেশে দেশে এই ধারণার আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য মানবাধিকার কর্মীরা দাবি তুলেছেন, তথ্যের অধিকার একটি মৌলিক মানবাধিকার, যা মানবজাতির সহজাত মর্যাদার সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কিত। একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য, সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য তথ্যের অবাধ প্রবাহ অত্যন্ত জরুরী। 'তথ্যের অধিকার' অংশগ্রহণমূলক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্যও অপরিহার্য বিষয়। আর্ন্তজাতিক মানবাধিকার ঘোষনাপত্রের আর্টিকেল ১৯ এবং আমাদের সংবিধানের ৩৯ নাম্বার অনুচ্ছেদ অনুযায়ী 'তথ্যের অধিকার হলো গণতন্ত্রের অক্সিজেন'। নির্বাচনে নির্বাচকমন্ডলী তাদের সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন না, যদি না তাদের তথ্য জানার অবাধ সুযাগ থাকে। সুতরাং তথ্যের উপর পূর্ণাঙ্গ অধিকার ছাড়া অংশগ্রহণমূলক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অর্থহীন।

সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্যেও 'তথ্যের অধিকার' অর্থাৎ তথ্যের অবাধ প্রবাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গোপনীয়তা সকল ক্ষেত্রেই দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার এবং অব্যবস্থাপনাকে উৎসাহিত করে। যে সকল দেশে ন্যূনতম নিবার্চনী গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় আছে সেই দেশের সরকার জনসাধারণের তথ্যের অধিকারককে এখন আর অস্বীকার করতে পারছেন না। তারা স্বীকার করছেন যে, তথ্যের অধিকার গণতন্ত্রের একটি মৌলিক অঙ্গ।

পৃথিবীব্যাপী তথ্যের অধিকার মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি পেলেও দক্ষিণ এশিয়ার কোন কোন দেশে এখনও জাতীয়ভাবে তথ্যের অধিকার আইনগত স্বীকৃত পায়নি। এটা যদি আইনের মাধ্যমে স্বীকৃতি হয়, তাহলেই কেবল তথ্যের স্বাধীনতা স্বীকৃতি পেতে পারে।

দক্ষিণ এশিয়ার বেশীরভাগ দেশে উপনিবেশিক আমলে ১৯২৩ সালের 'অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট' এবং অন্যান্য গোপনীয়তার আইন বলবৎ আছে যা তথ্য জানার ক্ষেত্রে জনসাধারণকে সুযোগ দেয় না। এই সব আইন আমাদের গোপনীয়তা রক্ষার সংস্কৃতি এবং সরকারী খাতের একগুয়েমীর প্রকাশ। এই আইনের কারণে সরকারি সুত্র থেকে তথ্য পাওয়া যায় না। আশার কথা, দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে এ

ধরনের আইন বদলের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

তথ্যের অধিকার নিশ্চিতকরণে গণমাধ্যমের ভূমিকা ব্যাপক। তারা সরকারের উপর সব সময় একটা নজরদারী করে এবং জনসাধারণকে তথ্য প্রবাহের মধ্যে রাখে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে গণমাধ্যম যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারে না-কারণ অফিসিয়াল গোপনীয়তা, যা গণমাধ্যমকে জনসাধারণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে এবং আরও কিছু আইন আছে-যা অযাচিতভাবে তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রকে নিয়ন্ত্রণ করে।

গোপনীয়তা সকল ক্ষেত্রেই দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার এবং অব্যবস্থাপনাকে উৎসাহিত করে। যে সকল দেশে ন্যূনতম নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় আছে সেই দেশের সরকার জনসাধারণের তথ্যের অধিকারককে এখন আর অস্বীকার করতে পারছেন না। তারা স্বীকার করছেন যে, তথ্যের অধিকার গণতন্ত্রের একটি মৌলিক অঙ্গ।

বর্তমানে পরিস্থিতি কিছুটা অনুকূলে, ইতোমধ্যে উচ্চ আদালত দক্ষিণ এশিয়ার কিছু দেশে তথ্যের অধিকারকে সাংবিধানিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার সুশীল সমাজ এবং মানবাধিকার কর্মীরা এখন দাবী জানাচ্ছে, তথ্যের অধিকারের স্বীকৃতি এবং যথাযথ মর্যাদা প্রদানের সাথে সাথে একটি আইন পাশ করা দরকার যাতে করে জনসাধারণ তার মৌলিক অধিকার হিসেবে তথ্যের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

আমাদের বিশ্বাস, তথ্যের অধিকার নিশ্চিত হলে গণতন্ত্র, সুশাসন প্রতিষ্ঠা পাবে এবং দুর্নীতি নির্মূল হবে। তাই এখনই সময় যত দ্রুত সম্ভব সরকারকে নতুন আইন তৈরির জন্য চাপ দেওয়া। আশার কথা-বিগত সরকারের আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমেদ বলেছেন, এ ব্যাপারে একটি আইনের খসড়া তৈরী হয়েছে। আমরা চাই দ্রুত উদ্যোগ এবং এর বাস্তবায়ন। অবশ্য শুধু আইন প্রণয়ন হলেই 'তথ্যের অধিকার' প্রতিষ্ঠিত হবে না। এ ব্যাপারে ব্যাপক জনসচেতনতা বাড়ানোর পাশাপাশি সরকারকে বিভিন্ন দপ্তর-এর কাঠামোগত পরিবর্তন ও উপনেবেশিক আমলাতান্ত্রিক মনোভাবেরও পরিবর্তন আনতে হবে।

লেখক : প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, নাগরিক উদ্যোগ।

আমাদেরও জানার অধিকার আছে

মুহাম্মদ আমিরুল হক তুহিন, উম্মে ওয়ারা মিশু, নাজমুন নাহার সুমি,
উম্মে সারাবন তহুরা, ফরজানা হোসেন তিন্নি, ইয়াসমিন বেগম, তাপস কান্তি বল

২০০৫ সালের ২ এপ্রিল চট্টগ্রামে কর্ণফুলী নদীর তীরে বিপুল পরিমাণ অত্যাধুনিক অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনা দেশের এক বিরাট সংখ্যক মানুষের মনে গভীর উৎকণ্ঠা সৃষ্টি করেছে। সেই সঙ্গে মানুষের মধ্যে জন্ম দিয়েছে বিপুল আগ্রহ ও কৌতূহলের। স্মরণকালের বৃহত্তম অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনার পর সরকার একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন তদন্ত কমিটিও গঠন করেছিল। কিন্তু তদন্ত কমিটির তদন্ত প্রতিবেদনের জন্য অপেক্ষা করেননি সরকার ও বিরোধী দলের দায়িত্বশীল রাজনীতিকরা। স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী অস্ত্র উদ্ধারের পরপরই ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে অস্ত্রপাতি নেড়েচেড়ে দেখার পর সাংবাদিকদের জানিয়েছেন যে, দেশের ভেতরে নাশকতার জন্য এসব অস্ত্র আনা হয়েছে। সরকারি দল ও বিরোধী দলের মহাসচিব ও সাধারণ সম্পাদকের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন রাজনীতিকরাও নানা রকমের মন্তব্য করেছেন।

দেশের নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তারা অবশ্য অনেক হিসাব-নিকাশ করে অস্ত্র উদ্ধারের এই ঘটনাটি খতিয়ে দেখার চেষ্টা করেছেন। কয়েকটি জাতীয় দৈনিকের অনুসন্ধানী সংবাদকর্মীরা খেটেখুটে আসল খবরের কাছাকাছি যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। নিশ্চুপ থেকেছে কিন্তু সরকার। জাতীয় জীবনে উদ্বেগজনক অনেক ঘটনার পরও আমরা এক ধরনের অজ্ঞানতার মধ্যেই আছি।

আমাদের দেশের আইন ব্যাপারটি কতটা মানুষের অধিকারের রক্ষাকবচ তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকলেও আমরা যারা আইনের ছাত্র-ছাত্রী তারা মানুষের কিছু অধিকারের কথা জানি। সে রকমই একটি অধিকার হচ্ছে তথ্যের অধিকার। জাতিসংঘের সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার ১৮ অনুচ্ছেদে তথ্যের অধিকারের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। আমাদের দেশের সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদকে দেশী-বিদেশী কয়েকটি মামলার রায়ের আলোকে ব্যাখ্যা করলে সেখানে তথ্যের অধিকারের নিশ্চয়তা পাওয়া যায়। তাহলে দেখা যাচ্ছে, তথ্যের অধিকার–যার কথা এতক্ষণ বললাম, সেটি কাজির গরুর মতো কেতাবে ঠিকই আছে। এবার কাজির সেই গরু গোয়ালে আছে কি না আমরা তার খোঁজ করব।

পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে ২০০৫ সালের ৪ এপ্রিল প্রথম আলোর শেষ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত সাইফুল আলম চৌধুরী প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, গত এক বছরে বগুড়া, রাজধানীর কুড়িল, পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে কমপক্ষে ২২ দফায় ভারী ও আধুনিক অস্ত্র-গোলাবারুদ উদ্ধার হয়েছে। কিন্তু কোনো ঘটনায় প্রকৃত জড়িতরা গ্রেপ্তার হয়নি। উদ্ধার হওয়া এসব অস্ত্রের মধ্যে অত্যাধুনিক রাইফেল, মেশিনগান, রকেট লঞ্চার থেকে শুরু করে ট্যাঙ্ক ধ্বংসকারী মাইন পর্যন্ত রয়েছে। এমন সব বিস্ফোরক দ্রব্য উদ্ধার হয়েছে, যার খুব সামান্য অংশ দিয়ে ঘরবাড়ী পর্যন্ত উড়িয়ে দেয়া সম্ভব। জাতীয় নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য থেকে জানা যায়, এসব অস্ত্র ব্যবহারের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোক সম্ভবত দেশে নেই। তাদের ইঙ্গিত থেকে মনে হয়, এই অস্ত্রগুলো দেশের একদিক দিয়ে ঢুকে অন্যদিক দিয়ে বের হয়ে যায়। দেশের রহস্যময় কিছু মানুষ মুটে-মজুরের মতো অস্ত্রগুলো এক হাত থেকে নিয়ে অন্য হাত দিয়ে মজুরি উপার্জন করে।

আমাদের দেশের আইন ব্যাপারটি কতটা মানুষের অধিকারের রক্ষাকবচ তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকলেও আমরা যারা আইনের ছাত্র-ছাত্রী তারা মানুষের কিছু অধিকারের কথা জানি। সে রকমই একটি অধিকার হচ্ছে তথ্যের অধিকার।

ব্যাপারটি এমন হলেও কিছুটা স্বস্তি খুঁজে পাওয়া যেত, অস্ত্রগুলো অন্তত বাংলাদেশের মানুষের বুক ঝাঁঝরা করার জন্য বা দেহ ছিন্নভিন্ন করার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে না- এই ভেবে। কিন্তু সেই উপায়ও নেই। কারণ দেশে প্রতিবছর যে শত শত মানুষ খুন হয় তার সবই যে ধারালো অস্ত্র দিয়ে শরীর কেটে টুকরো ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়ে কিংবা ধরে নিয়ে রাস্তায় ওপর ফেলে জবাই করে সংঘটিত হয়, তা কিন্তু নয়। লুকিয়ে রাখা গোপন বোমার বিস্ফোরণে ছিন্নভিন্ন হয়ে মানুষের মৃত্যুর খবরও দৈনিকে আসে। শত শত মানুষ হাত-পা উড়ে গিয়ে পঙ্গু হয়ে যায়, যার খবরও আমরা পত্রিকার পাতায় পড়ি। পুলিশের তৎপরতার খবর পত্রিকায় আসে। রাজনৈতিক নেতাদের উদ্দেশ্যমূলক বক্তব্যের খবরও পত্রিকায় আসে। ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দু-একজনের গ্রেপ্তার হওয়ার কথাও জানা যায়।

কিন্তু পত্রিকায় আসে না, কেন সরকার সংশ্লিষ্টদের জনগণের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয় না। কেন কোনো ঘটনারই বিচার হয় না। নাকি সরকার বিচার করতে পারে না অথবা করতে চায় না? তা আমরা জানি না।

রাজনৈতিক নেতাদের কথাবার্তায় মনে হয়, তারা এগুলো আগেই জানতেন বা ভালোই জানেন। তাই তারা নিশ্চিন্তে অত্যন্ত আস্থার সঙ্গে একে অপরকে দোষারোপ করেন। কিন্তু কেউ কারো বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেন না। তারা নিজেরা যা জানেন তা নিজেরা নিজেরাই জানেন।

তথ্য যে আমাদের দেশে কত মূল্যবান তা আমরা ভালোই বুঝতে পারি। এই তথ্য যাতে জনগণের কাছে না পৌঁছায় তার জন্য দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইন, সংবিধানে অন্তর্ভূক্ত গোপনীয়তার শপথের বিধান, সরকারি কর্মচারী বিধিমালার-মত কত আইনই না আছে আমাদের দেশে। কিন্তু এই তথ্য সরকারের কাছে যত মূল্যবান, আমাদের কাছে তার চেয়েও মূল্যবান। কারণ এমন অনেক তথ্য এখন আমরা পাচ্ছি না, যার সঙ্গে আমাদের জীবনের নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত। কয়েকদিন আগেই উদযাপিত হলো বাংলা নববর্ষ। প্রাণের টানে আমরা সেদিন রমনার বটমূলে গিয়েছিলাম। সেই প্রাণের উৎসবে আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে আমাদের মনে পড়েনি–১৪০৭ সালের পহেলা বৈশাখের কথা, যেদিন আমাদের এই উৎসবকে স্তব্ধ করে দিতে এক ভয়াবহ বোমা বিস্ফোরণ ঘটেছিল। মৃত্যু হয়েছিল অনেক মানুষের। কতগুলো মানুষের হাত–পা উড়ে গিয়েছিল তা মনে পড়ে না। সেই বোমা কারা ফাটিয়েছিল, কোথা থেকে পেয়েছিল, সেগুলো দেশে বানানো হয়েছিল নাকি বিদেশে বানানো হয়েছিল সেগুলোর স্পষ্ট কিছু জানি না। জানি না বিস্ফোরণের পর আইনি প্রক্রিয়া কতখানি এগিয়েছিল। প্রকৃত দোষীদের শনাক্ত করা গিয়েছিল কিনা। বিচার হয়েছিল কি না বা হবে কি না। হলে কবে হবে? এ ব্যাপারে সরকারের অবস্থান কী? পুলিশ বাহিনী ও বিচার বিভাগের কী ভূমিকা? এগুলোর অনেক কিছুই আমরা অনেকেই জানি না। তবে জানতে শিখেছি, আমাদের তথ্যের অধিকার আছে, মানবাধিকার আছে এবং সব সময়েই জানি পহেলা বৈশাখে রমনার বটমূলে যেতেই হবে।

গত ৪ এপ্রিল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক প্রেসনোটে মন্তব্য করা হয়েছে, চট্টগ্রামে অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধারের ঘটনায় সংবাদপত্রে কিছু অনুমাননির্ভর প্রতিবেদন ছাপা

হচ্ছে। প্রেসনোটে আরো বলা হয়, 'সরকার মনে করে তদন্ত চলাকালে বিষয়টির ব্যাপারে গণমাধ্যমে অনুমাননির্ভর প্রতিবেদন ছাপা হলে তা জনমনে বিভ্রান্তি ও ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করবে।' এটি সবাই মনে করে। কেবল সরকার ও বিরোধী দলের মন্ত্রী–এমপিরা তা মনে করেন বলে আমাদের মনে হয় না। কারণ তারা একের পর এক বিভ্রান্তিকর, দায়িত্বহীন মন্তব্য করে যাচ্ছেন তদন্ত শেষ হওয়ার অপেক্ষা না করে। আবার সংবাদপত্রগুলোকেও মাঝে-মধ্যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শাসিয়ে দিচ্ছেন অনুমাননির্ভর প্রতিবেদন ছাপানোর অভিযোগ তুলে। দেশে অস্ত্র, বোমা এবং মানুষের মৃত্যু নিয়ে একের পর এক যে ঘটনাগুলো ঘটছে তার সম্পর্কে সরকার থেকে আমরা নির্ভরযোগ্য কোনো তথ্য পাই না। যা পাই তা কয়েকটি সংবাদপত্রের মাধ্যমেই। আমাদের তথ্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার জন্য সংবাদপত্র ও সংবাদকর্মীদের ওপর যে সময়ে সময়ে অনেক ধরনের খড়্গ দেখানো হয় তা আমরা জানি। কিন্তু তথ্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে আমরা যে দেশ ও জাতি থেকে কতটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি বা যাচ্ছি, তা এই দেশের বিভিন্ন সময়ে সরকার গঠনকারী রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রীরা জানেন কি না তা জানি না।

তথ্য সরকারের কাছে যত মূল্যবান, আমাদের কাছে তার চেয়েও মূল্যবান। কারণ এমন অনেক তথ্য এখন আমরা পাচ্ছি না, যার সঙ্গে আমাদের জীবনের নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত।

সবশেষে বলি, দেশে কী হচ্ছে বা না হচ্ছে তা জানার অধিকার আমদেরও আছে। কারণ দেশ নিয়ে আমাদেরও চিন্তা হয় এবং শত দূর্বিপাকের মধ্যেও এই দেশটিকে নিজেদের বলেই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে।

লেখকবৃন্দ: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের বিভিন্ন বর্ষের ছাত্র–ছাত্রী।
সূত্র : প্রথম আলো, এপ্রিল ২৪, ২০০৪।

তথ্যে প্রবেশাধিকার কেন জরুরী

আবু নাসের মঞ্জু

"দ্বীপে থাকি বলে বাইরের বিষয়াদি সম্পর্কে কম জানতাম। আমাদের অত জ্ঞানবুদ্ধি ছিল না। আজ আমরা কিছুটা হলেও বাইরের খবরাখবর পাই, ভালো লাগে, চিন্তা কম হয়। মনে হয় আমরা এখন কিছু করতে পারবো।"

উদ্ধৃতি: 'জনতথ্য ঘরের কার্যকারিতা' শীর্ষক এক মতবিনিময় সভা থেকে।

ঘটনাচিত্র-১

নিঝুম দ্বীপের দিলারা বেগম প্রথম স্বামীর মৃত্যুর পর ১০ বিঘা খাসজমিতে দুটি সন্তান নিয়ে বসবাস করছিলেন। ১৯৯৮ সালে সামছুদ্দিন নামের এক গ্রাম্য ডাক্তার জমির লোভে তাকে দ্বিতীয় বিয়ে করে। বিয়ের তিন বছরের মধ্যে তাদের দুটি সন্তান হয়। এরই মধ্যে সামছুদ্দিন জমির পুরো ভোগ দখল নিশ্চিত করতে দিলারা বেগমকে হত্যা করে লাশ গুম করে। এ ব্যাপারে দিলারা বেগমের ভাই মফিজুর রহমান হাতিয়া থানায় মামলা দায়ের করেন। কিছুদিন পর মামলার কার্যক্রম স্থবির হয়ে যায়। টাকার অভাবে মফিজুর রহমান মামলার অগ্রগতি বিষয়ে তদবির করতে পারছেন না।

ঘটনাচিত্র-২

নিঝুম দ্বীপের বাতায়ন গুচ্ছগ্রামের মো: সারোয়ার ২০০১ সালে আসবাবপত্রসহ নগদ ১০ হাজার টাকা যৌতুক নিয়ে একই এলাকার লুৎফা বেগমকে বিয়ে করে। কিন্তু বিয়ের নিবন্ধন হয়নি। ইতোমধ্যে স্বামী আরও যৌতুকের জন্য লুৎফাকে মারধর শুরু করে। এক পর্যায়ে তাকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়। বর্তমানে লুৎফা অন্যের বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করছে। সামাজিকভাবে সালিসি বৈঠকে বিষয়টি নিষ্পত্তির চেষ্টা করা হলেও প্রভাবশালী স্বামী সালিসের রায় মানেনি। টাকার অভাবে দরিদ্র লুৎফা স্বামীর বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় নিতে পারছে না।

উল্লেখিত ঘটনা দুটিতে লুৎফা বা মফিজুর জানে না দরিদ্র মানুষের জন্য সরকারের আইন সহায়তা প্রকল্পের কথা।

ঘটনাচিত্র-৩

দূর্গাপুর নোয়াখালীর একটি প্রত্যন্ত ইউনিয়ন। এই ইউনিয়নের নারীরা ধর্মীয় বাধার কারণে ৪০ বছরেরও বেশি সময় ধরে ভোটাধিকার বঞ্চিত ছিল। বিষয়টি স্থানীয় প্রশাসন এবং সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের আড়ালে পড়ে থাকে। এমনকি মূলধারার গণমাধ্যমের দৃষ্টিতেও আসেনি। ২০০০ সালের ডিসেম্বরে একটি স্থানীয় সংবাদপত্রে বিষয়টি উঠে আসে। অতঃপর সংশ্লিষ্টদের দৃষ্টি পড়ে। গত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নারীরা প্রথমবারে মত ভোটাধিকার প্রয়োগ করে।

জনতথ্য ঘর : তথ্য সহায়তায় স্থানীয় উদ্যোগ

এমএমসি এক দশকের কর্মঅভিজ্ঞতায় দেখেছে উপকূলীয় অঞ্চলে জনঅধিকার বিষয়ক তথ্যের অপ্রতুলতা রয়েছে। তথ্য বঞ্চিত মানুষকে তথ্য দিয়ে ক্ষমতায়িত করার লক্ষ্যে এমএমসি এ অঞ্চলে দশটি জনতথ্য ঘর পরিচালনা করছে। জনতথ্য ঘরে এসে মানুষ তথ্য আদান প্রদানের মাধ্যমে একে অন্যকে সমৃদ্ধ করছে। অনদিকে সংবাদপত্রের মাধ্যমে জানতে পারছে দেশ বিদেশের খবরাখবর।

উপকূলীয় অঞ্চলে এ ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তবে চাহিদা অনুযায়ী পর্যাপ্ত তথ্য যোগান দেয়া গেলে তা স্থানীয় উন্নয়নকে নিশ্চিত করবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

লেখক: জেলা প্রতিনিধি, ম্যাস-লাইন মিডিয়া সেন্টার-এমএমসি, নোয়াখালী।

নারীর তথ্যের অধিকার

সৈয়দা আশরাফিজ জাহারীয়া মিথী

নারী পুরুষের সমতা নারীর মানবাধিকারের প্রধান শর্ত। অথচ নারী-পুরুষের সমতা অর্জনে অন্যতম মৌলিক প্রতিবন্ধক হচ্ছে বাস্তব বৈষম্য ও তাদের মর্যাদায় অসমতা। যদিও এ অসমতা বৃহত্তর সামাজিক-আর্থিক-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমি থেকে উদ্ভূত, তবুও একে নিছক শারীরিক পার্থক্যের ভিত্তিতে যুক্তিসঙ্গত করার চেষ্টা করা হয়। নারী শুধু নারী হবার কারণেই গৃহ এবং পারিবারিক পরিমন্ডলে নিজেকে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। সমাজে নারী সম্পর্কে এই গতানুগতিক বিশ্বাসের কারণেই নারী তার সবচেয়ে প্রয়োজনীয় মানবাধিকার তথ্যের অধিকার থেকে আজ বঞ্চিত। ফলে নারী ক্ষমতা কাঠামোতে প্রবেশের সমান সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। অধিকন্তু তথ্যের অধিকার ভোগ করতে না পেরে নারী দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনের কর্মকান্ডে অংশগ্রহন করতে পারছে না এবং দেশের ও দশের সেবায় তাদের যে সম্ভাবনা রয়েছে তাও ব্যাহত হচ্ছে।

মানবাধিকারের মূল ভিত্তি হলো– Equality, Freedom and Dignity যার পরিপূর্ণ বিকাশ ছাড়া মানবাধিকারের রসাচ্ছাদন সম্ভব নয়। তথ্যের অধিকার মানবাধিকারের মূল্যবোধকে শুধু জাগ্রতই করে না উন্নয়নের মূলধারায় নারীকে সম্পৃক্ত হবার পথ সৃষ্টি করে দেয়। অথচ এই একবিংশ শতাব্দীতে এসেও নারীর মানবাধিকারের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ এই দিকটি উপেক্ষিত রয়ে গেছে। নারী অধিকার, নারীমুক্তি, নারী আন্দোলন–পরিচিত এই শব্দগুলি নারীকে নির্যাতন, উপেক্ষা ও বঞ্চনা হতে রক্ষা করতে পারেনি। নারী আসলে কার বিরুদ্ধে লড়বে? সঠিক তথ্য যদি নারীর কাছে না থাকে? নারী নির্বাচন করবে কোনটি- যদি কল্যাণ অকল্যাণের মাঝে পাথর্ক্যটা বুঝবার মত প্রয়োজনীয় জ্ঞানে নারী প্রশিক্ষিত না হয়? নাগরিক হিসেবে নারী পুরুষের অধিকার সমান। তথ্যের স্বাধীনতা মূলত নির্ভর করে একটি দেশের সংবিধানের উপর। বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯(ক) অনুচ্ছেদ নাগরিকের তথ্য চিন্তা ও মত প্রকাশের অধিকারকে নিশ্চয়তা দিয়েছে। কিন্তু অন্যদিকে সংবিধানের ৩৯(২) অনুচ্ছেদে এই অধিকারকে Reasonable

Restriction'-এর নামে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনস্বার্থ, নৈতিকতা ও আদালত অবমাননা ইত্যাদি সীমাবদ্ধতার মাঝে আটকে রেখেছে। এই প্রেক্ষাপটে নারীর জন্য আদৌ সম্ভব নয় তথ্যের অধিকার ভোগ করা, যেখানে নারীর বাক ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা 'Reasonable Restriction' দ্বারা সীমিত করা হয়েছে। এর ফলে হাজার বছরের পুরনো প্রথা ও কুসংস্কার আকড়ে থাকা নারী নতুন তথ্য ও জ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হতে পারছে না। সম্প্রতি শিক্ষিত নারীর সংখ্যা বেড়েছে ঠিকই, কিন্তু তাদের কাছেই বা তথ্য রয়েছে কতটুকু; সেটাও আজ খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। কারণ সংবিধান এক বস্তু আর সমাজের অভ্যস্ত আচরণ অন্য বস্তু। নারীর মানবাধিকারকে উন্নীত করতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন মানবাধিকার সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের সঙ্গে নারীকে পরিচিত করানো। জেন্ডারভিত্তিক পার্থক্য ছাড়াও নারীরা জাতি, বর্ণ, গোষ্ঠী ও জাতীয়তার কারণে জটিল বৈষম্যের শিকার। নারী বেশিমাত্রায় দারিদ্র ও নিরক্ষরতা, নিম্নমানের শিক্ষা, চাকরিতে বৈষম্য, অর্থনীতিতে অবদানের অস্বীকৃতি ও স্বাস্থ্য চাহিদা সম্পর্কিত জ্ঞানের অভাবে ভুগছে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা– এর এস্টিমেইট ও প্রজেকশন অনুযায়ী বিশ্বের শ্রমশক্তির শতকরা ৩৫ শতাংশ হচ্ছে নারী। কিন্তু শ্রমিকরা কর্ম ও পারিশ্রমিক সংক্রান্ত তথ্যের অভাবে নারী শ্রমিক আজও নিম্নস্তরের পারিশ্রমিক ও নিরাপত্তহীনতায় কাজ করে যাচ্ছে। গত শতকের শেষের দশকে শুরু হয়েছে Peoples movement on access to justice. এই মুভমেন্টে নারীর সার্বিক অংশগ্রহণ এখনও উল্লেখ করার মত নয়। নারী সামাজিক ন্যায় বিচার প্রাপ্তির আন্দোলনে যতটুকু সম্পৃক্ত, তার চেয়ে বেশি বঞ্চিত এই ন্যায়বিচার প্রাপ্তি থেকে। আইনের পরিবর্তন এবং এর কার্যকর বাস্তবায়নের মধ্যে যে বিরাট ব্যবধান রয়েছে তা নারীর পূর্ণ অংশগ্রহণে

> *মানবাধিকারের মূল ভিত্তি হলো– **Equality, Freedom and Dignity** যার পরিপূর্ণ বিকাশ ছাড়া মানবাধিকারের রসাচ্ছাদন সম্ভব নয়। তথ্যের অধিকার মানবাধিকারের মূল্যবোধকে শুধু জাগ্রতই করে না উন্নয়নের মূলধারায় নারীকে সম্পৃক্ত হবার পথ সৃষ্টি করে দেয়।*

বাধার সৃষ্টি করে। আইনের আশ্রয় নেওয়া মাত্রই নারী-উপকৃত হয় না। নারীদের আইন সম্পর্কিত জ্ঞান, আইনের দ্বারস্থ হবার সুযোগ এবং আইনসম্মত অধিকার ভোগের সুযোগ খুবই সীমিত। অধিকন্তু তাদের অধিকার সম্পর্কে তথ্য প্রচারে ত্রুটি বা অপর্যাপ্ততা এবং বিচার ব্যবস্থার আশ্রয় গ্রহণে তাদের বাস্তব অসুবিধা অনেক ক্ষেত্রেই কাঙ্খিত ফললাভে বিঘ্ন ঘটায়।

তথ্যের অধিকার মানবাধিকারের ধারণার সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। এই অধিকার মানুষের সমতা ও বৈষম্যহীন জীবনের প্রধান শর্ত। অথচ ইতিহাসের শুরু থেকেই এই মানবাধিকারটি চরমভাবে লংঘিত হয়ে আসছে। নারীর সম্মান, মর্যাদা ও স্বাধীনতা বিষয়টি উপেক্ষিত থেকে গেছে সমস্ত আলোচনা-পর্যালোচনার আড়ালে। জাতিসংঘ কর্তৃক প্রকাশিত মানব উন্নয়ন রিপোর্ট ২০০৩-এ স্পষ্টভাবে নারীর তথ্য পাবার গুরুত্বকে তুলে ধরা হয়েছে। এই রিপোর্ট নারীর তথ্যের অধিকারকে ব্যাখ্যা করেছে এভাবে 'মানবাধিকার ও মানব উন্নয়নের একই ভিশন এই যে, দুই-ই মানুষের স্বাধীনতা, কল্যাণ ও মর্যাদা প্রত্যাশা করে। তথ্যের অধিকারও একই রকম প্রত্যাশাকে গুরুত্বের সঙ্গে স্বীকৃতি দিয়েছে। নারী সমাজকে শুধু লিঙ্গজনিত পার্থক্যের কারণে এই অধিকার ভোগ হতে বঞ্চিত করা যাবে না। নারীর জন্য তথ্য প্রয়োজন–

- বৈষম্য হতে স্বাধীনতার জন্য।
- চাহিদা ও অভাব হতে স্বাধীনতার জন্য।
- মানবীয় গুণাবলী বিকাশের স্বাধীনতার জন্য।
- সব রকম ভয়, হুমকি, নির্যাতন, গ্রেফতার ও সহিংসতা থেকে স্বাধীনতার জন্য।
- আইনের শাসনের লংঘন ও অবিচার হতে স্বাধীনতার জন্য।
- বাক ও চিন্তায় এবং সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতার স্বাধীনতার জন্য।

দক্ষিণ এশিয়ার অনেক দেশই নারী অধিকারের উন্নতির জন্য সংবিধানে তথ্যের অধিকারকে সন্নিবেশিতি করেছে। ভারতের রাইট টু ইনফমেশন আন্দোলনের কথাও আমরা জানি। মিশর ও তিউনিশিয়া অতি সম্প্রতি তথ্যের অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়ে নারীর তালাক প্রদান ও জাতীয়তার অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

মানবাধিকার ও জবাবদিহীতার সংস্কৃতি গড়ে তুলতেও তথ্য একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। নারীর জন্য ক্ষমতার সংস্কৃতি গড়ে তুলতেও তথ্য তেমনিভাবে শক্ত একটি মাধ্যমের ভূমিকা পালন করে। সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা ১৯৪৮সহ অন্যান্য কয়েকটি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার চুক্তি নারীর তথ্য পাবার অধিকারকে গুরুত্ব দিয়েছে। অথচ নারীরা এই চুক্তিগুলি সম্পর্কে জানে না। কিছু বেসরকারি সংস্থার কল্যাণে মুষ্টিমেয় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নারী ছাড়া অধিকাংশ নারীই জানে না সিডও সনদ কি, তাদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ছাড়া যে মানবাধিকারের স্বাদ গ্রহণ সম্ভব নয়– এটাও তাদের কেউ বলে দেয়নি। কারণ তারা নারী–দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। পুরুষের অধ:স্তন। কম মর্যাদা পাবে। ধর্মীয় সংস্কৃতির প্রভাবে নির্যাতন অহরহ চলছে। কোন কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র আবার স্ত্রী পেটানোতে ১ম স্থান অধিকার করে নিয়েছে। অতএব নারীর বেশি কথা বলা যাবে না, মতামত দেবার দরকার কি, সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না–তাদের কি দরকার এই তথ্য জানাবার যে-

সম্প্রতি শিক্ষিত নারীর সংখ্যা বেড়েছে ঠিকই, কিন্তু তাদের কাছেই বা তথ্য রয়েছে কতটুকু; সেটাও আজ খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। কারণ সংবিধান এক বস্তু আর সমাজের অভ্যস্ত আচরণ অন্য বস্তু।

- স্ত্রীরাও স্বামীকে তালাক দিতে পারবে
- জোরপূর্বক অভিভাবক বিয়ে দিতে পারবে না
- তালাক হলে দেনমোহর মাফ হয় না
- নারী নিজের পছন্দমত সময় ও বিরতিতে সন্তান নিতে পারবে
- গ্রেফতার হলে বিনামূল্যে আইনী সহায়তা পাবে
- জাতীয় জরুরী পরিস্থিতিতে নারীর মৌলিক মানবাধিকার অটুট থাকবে।

মানবিক মর্যাদার ভিত্তিতে নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নারী পুরুষের সমান অধিকার ও সুযোগ নিশ্চিতকরণ খুবই জরুরি। কিন্তু প্রশ্ন হলো, নারী মানবাধিকার সম্পর্কেই বা কতটুকু জানে? গৎবাধা ধারণার বশবর্তী নারী তার জানার অধিকার,

মতামত প্রদান ও বিবেকের স্বাধীনতা থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছে। এই মৌলিক অধিকারটি না থাকলে যে সার্বিক মানবাধিকার লংঘিত হয় নারীকে এই বোধটুকু আজও দেওয়া হয়নি। চলমান স্বাভাবিক জীবন ছাড়াও সংকটাপূর্ণ পরিস্থিতিতে নারী নিজেকে রক্ষা করতে অপারগ হয়েছে শুধু সেই সংকটের নিরসনজনীত সমাধানের অভাবে। কারণ নারী জানে না তার জন্য কি কি প্রতিকার রয়েছে। তাইতো বিশেষ উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে নারী আরো বেশি অসহায় হয়ে যায়। যেমন– বন্যা ও খরা কবলিত নারী, দারিদ্র্যের শিকার নারী, নির্যাতিত ও দুস্থ নারী, বেশ্যাবৃত্তির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত নারী, জীবিকা থেকে বঞ্চিত নারী, শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী নারী, গ্রেফতারকৃত নারী, উদ্বাস্তু ও স্থানচ্যুত নারী, পরবাসী নারী, সংখ্যালঘু ও আদিবাসী নারী।

নারীর মানবাধিকার ব্যাখ্যায় ও রক্ষায় তথ্য ও তথ্যের অধিকার এক গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক। ১৯৯৫ সালের বেইজিং নারী সম্মেলনে জাতিসংঘ মহাসচিব বলেছিলেন, নারীর তথ্য পাবার অধিকারকে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত। এটি বর্তমানে বিভিন্ন দেশে আলোড়ন তুলেছে। তথ্য ছাড়া নারীর মানবাধিকার পঙ্গু। হ্যাঁ তথ্যই নারীর শক্তি। চলমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে জেন্ডার ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে নারীকে অনেক অনেক বেশি জানতে হবে। তার অনেক তথ্য প্রয়োজন।

তথ্যসূত্র:

মানব উন্নয়ন রিপোর্ট-২০০৩: UNDP, হিউম্যান রাইটস্ ইন বাংলাদেশ-২০০০, আইন ও সালিশ কেন্দ্র, ফিউচার অফ হিউম্যান রাইটস-উপেন্দ্র বকসী, Oxford University Press, Delhi, 2002, নারীমুক্তি, ওমর ইমতিয়াজ, প্রজন্ম, দশম বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা, মার্চ-১৯৯১।

সূত্র : নারী দিগন্ত, আজকের কাগজ, এপ্রিল ৩, ২০০৫।

সম্পদ আত্মসাতের ন্যায় তথ্য গোপন করাও দুর্নীতি

রফিকুল ইসলাম

১.

জীবন ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তথ্য জানা মানুষের অন্যতম মৌলিক অধিকার। আন্তর্জাতিক সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাতে নাগরিকদের তথ্য পাওয়ার যে অধিকারের কথা বলা হয়েছে, বাংলাদেশ সেটার অন্যতম স্বাক্ষরকারী দেশ, বাংলাদেশের সংবিধানেও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে। কিন্তু, তথ্যের অবাধ চলাচলের উপর বিধিনিষেধ এখনও বলবৎ রয়েছে। এ পরস্পরবিরোধী আইনী পরিবেশে আমাদের শাসকগোষ্ঠী ঔপনিবেশিক আমলের আইনকানুন দিয়ে নাগরিকদের তথ্য জানার গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করে চলেছেন। এখন সময় এসেছে এটা নিয়ে কথা বলা, জনমত গড়ে তোলা এবং জনপ্রতিনিধিদের এমন একটি আইন তৈরি করতে বাধ্য করা–যার মাধ্যমে নাগরিকদের জন্য তথ্যের অবাধ চলাচলের নিশ্চয়তা বিধান করা হবে।

মানুষকে ক্ষমতাহীন ও অধিকার বঞ্চিত করে রাখার জন্য ক্ষমতার ধারকেরা প্রথমেই যে কাজটি করেন তা হলো প্রকৃত তথ্য গোপন করা অথবা বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা। কিন্তু, সংবিধান অনুযায়ী দেশের মালিক যখন জনগণ, তখন অন্য সব কিছুর মত তথ্যের উপর মালিকানাও তার বাইরে নয়। সম্পদ চুরি বা আত্মসাৎ করার ন্যায় তথ্য গোপন করাও দুর্নীতি।[১]

যারা ব্যক্তিগত স্বার্থে ক্ষমতার অপব্যবহার করে তথ্য গোপন অথবা অবাধ তথ্য প্রবাহে বাধার সৃষ্টি করেন, তারা এটা করেন রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার অজুহাতে নিজেদের গোষ্ঠীগত, দলীয় এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে। যেমন, বিদেশী কোম্পানীগুলোর সঙ্গে সরকারের সম্পাদিত চুক্তির শর্তসমূহ জনগণকে জানতে দেয়া হয়নি। অথচ, জনগণই এ সম্পদের মালিক এবং তথ্য জানার অধিকারও তার আছে। প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী হিসেবে যারা কাজ করেন অথবা জনপ্রতিনিধি হিসেবে যারা আছেন তাদের দায়িত্ব জনগণকে এসব তথ্য জানানো, গোপন করা নয়।

২.

ভারতের রাজস্থান রাজ্যের গরীব কৃষক, শ্রমজীবী মানুষ তথ্য অধিকার আদায়ের যে মহাসড়ক আমাদের সামনে উন্মোচন করে দিয়েছেন, আমরা তা উদাহরণ হিসেবে নিতে পারি। রাজস্থানের অত্যন্ত দরিদ্র এবং উন্নয়ন থেকে পিছিয়ে পড়া একটি এলাকা ভিম তেসিল। এ এলাকার উন্নয়নের জন্য বরাদ্দকৃত বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান যেমন বিদ্যালয়, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ছোট বাঁধ এবং কমিউনিটি কেন্দ্র নির্মাণ কাগজে-কলমে বাস্তবায়ন হয়ে গিয়েছে এবং এমনকি এসকল কাজে মাস্টার রোলে তালিকাভুক্ত শ্রমিকদের মজুরি পরিশোধও দেখানো হয়েছে। কিন্তু, এলাকার জনসাধারণ বুঝতে পারেন, এসব প্রকল্পে বড় ধরণের দুর্নীতি ও অর্থ লোপাটের ঘটনা ঘটেছে। কেননা, নির্মিত বিদ্যালয়ের কোন ছাদ নেই, স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কোন দেয়াল নেই, যে বাঁধটি নির্মাণ করা হয়েছে তা অসম্পূর্ণ, এমনকি কমিউনিটি কেন্দ্রের কোন দরজা-জানালা পর্যন্ত নেই। এই পরিপ্রেক্ষিতে *ভিম তেসিল* গ্রামের জনসাধারণ স্থানীয় পঞ্চায়েতের কাছে দাবী জানাতে থাকে খরচের বিল-ভাউচার এবং যাদেরকে কাজের বিনিময়ে মজুরি দেয়া হয়েছে বলে দাবী করা হচ্ছিল সেসব মাস্টার রোল শ্রমিকদের নামের তালিকা প্রদানের জন্য। গ্রামের সাধারণ নাগরিকদের এ দাবী প্রথমদিকে অগ্রাহ্য করছিলেন কর্তাব্যক্তিরা। অবশেষে, কয়েক বছর ধরে কর্মকর্তাদের দরজায় দরজায় গিয়ে অনেক হয়রানি ও চেষ্টার পর তারা কিছু ভাউচার, বিল এবং গুরুত্বপূর্ণ কিছু দলিলের ফটোকপি পান।

পরস্পরবিরোধী আইনী পরিবেশে আমাদের শাসকগোষ্ঠী ঔপনিবেশিক আমলের আইনকানুন দিয়ে নাগরিকদের তথ্য জানার গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করে চলেছেন। এখন সময় এসেছে এটা নিয়ে কথা বলা, জনমত গড়ে তোলা এবং জনপ্রতিনিধিদের এমন একটি আইন তৈরি করতে বাধ্য করা–যার মাধ্যমে নাগরিকদের জন্য তথ্যের অবাধ চলাচলের নিশ্চয়তা বিধান করা হবে।

প্রাপ্ত তথ্য থেকে তারা জানতে পারেন, তাদের অনুমান সঠিক, দুর্নীতির মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ অর্থ আত্মসাৎ করা হয়েছে। তারা আরো জানতে পারেন, মাস্টার

রোলে যাদের নাম লেখা আছে বাস্তবে তাদের অনেকের কোন অস্তিত্বই নেই অথবা অনেক আগেই তারা মারা গেছেন। রাজস্থানের একটি সংগঠন *মজদুর কৃষক শক্তি সংস্থা* (এমকেএসএস) জনগণের এই দাবীকে সংগঠিত করতে সহায়তা করে। জনগণের তথ্য পাওয়ার এই আন্দোলন পরবর্তীকালে ছড়িয়ে পড়ে রাজস্থানের অন্যত্র এবং পরবর্তীকালে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০০৫ সালের মে মাসে ভারতের লোকসভায় পাশ হয় তথ্য অধিকার আইন। যার ফলে ভারতের জনগণ এখন সহজেই তথ্য দাবী করতে পারবেন নির্দিষ্ট ফি ও ফরম পূরণ করে। কর্মকর্তারা এখন চাহিদামত তথ্য প্রদান করতে বাধ্য।

৩.

একটা দেশ কতটা গণতান্ত্রিক তা পরিমাপের অন্যতম মাপকাঠি হল সেখানে তথ্য কতটা সহজলভ্য, নাগরিকদের জানার অধিকার কতখানি বিস্তৃত। সামরিক ও একনায়ক দ্বারা পরিচালিত সরকারের সঙ্গে গণতান্ত্রিক সরকারের এটাই সবচেয়ে বড় পার্থক্য। আমাদের দেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কিছু মাত্রায় প্রসারিত হলেও নাগরিকদের জানার অধিকারকে এখনও বৃটিশ ঔপনিবেশিক আমলের কালাকানুন দ্বারা রুদ্ধ করে রাখা হয়েছে। এই সকল আইনগুলোর মধ্যে রয়েছে:

সাক্ষ্য আইন ১৮৭২
অফিসিয়াল সিক্রেসি এ্যাক্ট, ১৯২৩
রুলস্ অব বিজনেস, ১৯৯৬
সরকারী কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯

তথ্যের উন্মুক্ততা অতীব গুরুত্বপূর্ণ কারণ সরকার কতটা যথাযথভাবে কাজ করছে এবং কিভাবে দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে সে বিষয়ে নাগরিকরা যেমন জানতে পারবেন তেমনি তারা বিভিন্ন বিষয়ে খোলামেলা বিতর্ক ও আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন। গণতন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে তথ্যের অবাধ প্রবাহের বিষয়টি ওতপ্রতভাবে সম্পৃক্ত। কিন্তু যারা ক্ষমতাবান তারা প্রায়শ ব্যক্তিগত স্বার্থে তথ্যের অবাধ চলাচলের উপর বাধানিষেধ আরোপ করেন যা গণতান্ত্রিক রীতিনীতির পরিপন্থী। দরপত্র আহ্বান, ক্রয়-বিক্রয়, অবকাঠামো নির্মাণ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী ও কর্মকর্তাদের দেখা যায়

বিভিন্ন অজুহাতে, বিশেষত ১৯২৩ সালের সিক্রেসি অ্যাক্টের দোহাই দিয়ে তথ্যের অবাধ চলাচলের উপর বাধা সৃষ্টি করে থাকেন। এর ফলে এ সংক্রান্ত বিষয়সমূহে অস্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধার অভাবে জনগণের স্বার্থ বিরোধী বিভিন্ন চুক্তি স্বাক্ষর, ক্রয়-বিক্রয় ও বহুবিধ লেনদেন সম্পাদিত হয়ে থাকে যা দুর্নীতির মাত্রাকে বহুগুন বাড়িয়ে দেয় এবং দারিদ্র্য বিমোচন, শাসন ব্যবস্থার সংস্কার তথা জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠার প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে। অর্থনীতিবিদ জোসেফ স্টিগলিজ যথার্থই মনে করেন, সরকারের তত্ত্বাবধানে জনসাধারণের যে সকল সম্পদ রক্ষিত থাকে, যেমন চেয়ার বা বিল্ডিং সেগুলোর মত তথ্যও এক ধরনের সম্পদ, জনগণই তার মালিক ।[২] স্টিগলিজ অন্য দু'জন অর্থনীতিবিদের (জর্জ একারলফ এবং মাইকেল স্পেন্স) সঙ্গে যৌথভাবে ২০০১ সালে যে ক্ষেত্রটিতে গবেষণার জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন, তার নাম অ্যাসিমেট্রিক ইনফর্মেশন বা অ-সমান তথ্য। এক পক্ষ বেশি জানে, অপরপক্ষ কম জানে। তথ্যের এই অ-সমানতার কারণে অর্থনৈতিক আচরণ বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কি ধরণের প্রভাব পড়ে স্টিগলিজ ও তাঁর সহকর্মীরা সেটাই বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন।

একটি ইউনিয়নে কতজন ব্যক্তিকে ভিজিএফ কার্ড দেয়া হচ্ছে তা গ্রামবাসীদের জানা থাকলে তারা সহজেই মতামত দিতে পারবে প্রক্রিয়াটির সঠিকতা সম্পর্কে। অপরদিকে, এর মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদের দায়বদ্ধতাও বৃদ্ধি পাবে।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নাগরিকদের সম্পৃক্ত করা, তাদের মতামত শোনা ও গ্রহণ করার জন্য দরকার নাগরিকদের মধ্যে তথ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা। উদাহরণ স্বরূপ, একটি ইউনিয়নে কতজন ব্যক্তিকে ভিজিএফ কার্ড দেয়া হচ্ছে তা গ্রামবাসীদের জানা থাকলে তারা সহজেই মতামত দিতে পারবে প্রক্রিয়াটির সঠিকতা সম্পর্কে। অপরদিকে, এর মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদের দায়বদ্ধতাও বৃদ্ধি পাবে। জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীগণ যদি ভোটারদের নিকট হাইকোর্টের নির্দেশনা মেনে নিজেদের সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহ প্রচার করেন তাহলে আমাদের গণতন্ত্রের বিকাশের জন্য তা অত্যন্ত সহায়ক হবে।

যারা তথ্যকে গোপন করেন তারা গণতন্ত্রের বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করতে চান। গণতন্ত্রের পূর্ণ বিকাশের জন্য গোপনীয়তার সংস্কৃতিকে পরিত্যাগ করতে হবে। গোপনীয়তার সংস্কৃতিই অবৈধ ক্ষমতা ও কর্মকান্ডকে টিকে থাকতে সহায়তা করে। একটা ভারসাম্যপূর্ণ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের জন্য জনজীবনের সকল ক্ষেত্রে তথ্যের অবাধ প্রবাহের কোন বিকল্প নেই। সে লক্ষ্যে ঔপনিবেশিক আমলের আইনকানুন বাতিল করে এমন একটি আইন প্রণয়ন করা দরকার যার মাধ্যমে সরকারী, বেসরকারী এবং এ দেশে কর্মরত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পর্কে সাধারণ মানুষ সহজেই তথ্য পেতে পারে। আমরা এমন একটি মুক্ত পরিবেশ থেকে কতটা দূরে?

তথ্যসূত্র :

১. আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ঘোষণা, ধারা ১৯।
২. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, ধারা ৩৯।
৩. জোসেফ স্টিগলিজ, On Liberty, the Right to Know, and Public Discourse The Role of Transparency in Public Life, 1999.

লেখক : একটি বেসরকারী সংস্থায় কর্মরত।

তথ্যের অপ্রতুলতা উপকূলীয় এলাকায় ব্যাপক প্রাণহানি এবং তথ্য অধিকারের প্রাসঙ্গিকতা

মাহমুদ হাসান

বিগত কয়েক দশকে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে গ্রহণ করা হয়েছে বহুমুখী কর্মসূচী। দারিদ্র্য বিমোচনের নিত্য নতুন ধারণা প্রতিনিয়ত উন্নয়ন কর্মকান্ডে নতুন মাত্রা যোগ করে চলেছে, উন্মেষ ঘটেছে অনেক নতুন নতুন দর্শন, প্রবন্ধ ও কৌশলের। উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণের ক্ষেত্রে অনেকগুলো প্রসঙ্গের মধ্যে যে বিষয়গুলো সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে সেগুলো হলো দরিদ্র জনগণের অবকাঠামো নির্মাণ, সুষ্ঠ পয়:নিস্কাশন ব্যবস্থা, বিশুদ্ধ পানির ব্যবহার, পর্যাপ্ত নিরাপত্তা, গ্রামীণ পুঁজিগঠন এবং ঋণ প্রাপ্তির সুযোগ। উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণে যে বিষয়টি এতকাল গুরুত্ব পায়নি তা হলো তথ্য প্রাপ্তির সুযোগের অভাব। কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিষয়টি ব্যাখ্যার দাবী রাখে। তথ্য প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তির মাধ্যমে নির্ধারিত হচ্ছে উন্নত ও অনুন্নত জীবনের মানদন্ডের সীমারেখা।

ধরা যাক অতিসম্প্রতি ঘটে যাওয়া ঘূর্নিঝড়ে জেলেদের জীবনহানীর কথা। ১৯ সেপ্টেম্বরের এই প্রলয়ংকারী ঘূর্নিঝড় সমগ্র জাতির জন্য অত্যন্ত বেদনাস্পর্শী। আশঙ্কা করা হচ্ছে এই ঘূর্নিঝড়ে কয়েকশত জেলে প্রাণ হারিয়েছে, নিখোঁজ রয়েছে প্রায় ৩০০০-৪০০০, সমুদ্রে ডুবে গেছে বাংলাদেশ নেভীর একটি পেট্রোল শীপসহ প্রায় ৫০০ ট্রলার এবং নৌকা। এটি বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত বেসররকারী হিসাব। সমুদ্র ভয়ঙ্কর উত্তাল হওয়া সত্ত্বেও বেশী মাছ পাবার আশায় কিছু জেলে জীবন বাজি রেখে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়েছিল। জীবিকার অমোঘ টানেই তার হয়তো দুঃসাহসী হয়ে উঠেছিল। তারপরও বলবো সতর্ক হবার কোনো বিকল্প নেই। সাধারণত নিজেদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে তারা সমুদ্রে বিচরণ করে এবং সেইমতো চেষ্টা করে জীবনকে নিরাপদ রাখতে। রেডিও কিংবা অন্যান্য মাধ্যম অবশ্য রয়েছে, কিন্তু তার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের কার্যকারিতা এবং সময়োপযোগিতা নিয়ে প্রশ্নের ঝড় তোলা যায়। ছোট্ট এক লাইনের একটি তথ্য "আজ সমুদ্রে মাছ ধরতে যাবেন না কারণ সাগর আজ উত্তাল এবং প্রচন্ড ঝড়ের

আশঙ্কা রয়েছে।" এ শব্দগুলো সময়মত না জানার কারণে হারিয়ে গেল কয়েকশত জীবন। ঝড়ের তিনদিন পরেও উপকূলবর্তী জেলায় সমুদ্রে অগণিত লাশ ভেসে যাচ্ছে। মার্কেন্টাইল ও মেরিন বিভাগের জনৈক প্রিন্সিপাল অফিসারের মতে প্রাথমিকভাবে তারা দেখেছেন যে আবহাওয়া অফিস যথাসময়ে আবহাওয়া বার্তা প্রচারে ব্যর্থ হয়েছে (নিউ এইজ, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০০৬)। ঘূর্নিঝড় কবলিত জেলেরাও জানান তারা সঠিক সময়ে কোন আবহাওয়া বার্তা পাননি। তথ্য প্রযুক্তির বিপ্লব বলে খ্যাত বর্তমান যুগে এরকম ধ্বংসযজ্ঞ আমাদের হতবাক করে, করে ব্যথিত এবং এ ধরনের ধ্বংসযজ্ঞ মোটেও কাম্য নয়। কারণ তথ্য প্রযুক্তির কল্যাণেই এধরনের ধ্বংসযজ্ঞের খবর আমরা নিমেষেই পেয়ে যাচ্ছি। কিন্তু এই 'আমরা' হচ্ছি সমাজের সেই অংশ যাদের তথ্য-প্রযুক্তির সহজলভ্যতা রয়েছে। এ ঘটনার মাধ্যমেই বোঝা যায়, তথ্য না জানার মাধ্যমে কিভাবে মূল্যহীন হয়ে পড়ছে জীবন, আর্থিক ক্ষতির শিকার হচ্ছে মানুষ, দরিদ্র আরো দরিদ্রতর হচ্ছে, উন্নয়ন বাধাগ্রস্থ হচ্ছে, তৈরী হচ্ছে বঞ্চনা ও দূর্ঘটনার নানা দুঃসহ স্মৃতি- যা কারো কাম্য নয়।

ঘূর্নিঝড় কবলিত জেলেরাও জানান তারা সঠিক সময়ে কোন আবহাওয়া বার্তা পাননি। তথ্য প্রযুক্তির বিপ্লব বলে খ্যাত বর্তমান যুগে এরকম ধ্বংসযজ্ঞ আমাদের হতবাক করে, করে ব্যথিত এবং এ ধরনের ধ্বংসযজ্ঞ মোটেও কাম্য নয়।

তাই 'তথ্য-অধিকার' অতীব প্রাসঙ্গিক। গত কয়েকবছর 'তথ্য-অধিকার' আইন নিয়ে দেশে ব্যাপক আলোচনা হচ্ছে। ইতোমধ্যে আইনটির খসড়াও তৈরী করা হয়েছে। হয়তো আগামী সরকারের সময়ে বিলটি পাশ হয়ে যাবে এবং কার্যকর হবে তথ্য-অধিকার আইন। এ ধরণের একটি সময়োপযোগী আইন কার্যকর করার মাধ্যমে আমরা বিশ্বের আরও অনেক দেশ যারা এ ধরনের অধিকার প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী তাদের পাশাপাশি অবস্থানে দাঁড়াবো। এ বিলে অন্যতম আলোচ্য বিষয় হলো 'জনগনের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।' যে সকল গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যা জনগণের জন্য মঙ্গলজনক এবং জানা প্রয়োজন, যেগুলো Public Secrecy Act

Management and Resources Development Initiative
64
2/9, Sir Syed Road (3rd Floor) Mohammadpur Dhaka-1207

এর মাধ্যমে এতকাল প্রত্যাখ্যানের সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে তার হয়তো অবসান অবস্থান ঘটবে এ আইনের মাধ্যমে। কিন্তু প্রশ্ন হলো এ আইন দরিদ্রপীড়িত জনগণের সার্বিক জীবনমান উন্নয়নে কোন কার্যকর ভূমিকা রাখবে কি?

তথ্য-অধিকার আইন জনগনের তথ্য-অধিকার প্রতিষ্ঠিত করবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলের জনগণ প্রয়োজনীয় তথ্যগুলোই পায়না। অর্থাৎ যেসকল তথ্য সবার জন্য উন্মুক্ত সে তথ্যগুলো সহজ প্রাপ্তির কোনো সুযোগ গ্রামাঞ্চলের জনগণের নেই। তাই প্রশ্ন জাগে তথ্য অধিকারের বিষয়টি শুধু আইন পাশ নয়, তথ্যের অপ্রতুলতা মানুষের জীবনে কতটা বঞ্চনা সৃষ্টি করে তা উপলব্ধি করে তাদের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এবং কোন মাধ্যমে সবচেয়ে দ্রুত তথ্য পৌছানো যায় সেই উপায়টি ভেবে দেখতে হবে।

তাই প্রশ্ন জাগে তথ্য অধিকারের বিষয়টি শুধু আইন পাশ নয়, তথ্যের অপ্রতুলতা মানুষের জীবনে কতটা বঞ্চনা সৃষ্টি করে তা উপলব্ধি করে তাদের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এবং কোন মাধ্যমে সবচেয়ে দ্রুত তথ্য পৌছানো যায় সেই উপায়টি ভেবে দেখতে হবে।

যে দুঃখজনক ঘটনার বর্ণনা দিয়ে লেখাটি শুরু করেছিলাম সেক্ষেত্রেও তথ্য প্রাপ্তির বিষয়টিই ছিল মুখ্য। হয়তো তাদের কাছে একমাত্র মাধ্যম রেডিওতে সতর্কবাণী দেয়া হয়েছিল। কিন্তু সে বাণী কি হতভাগ্য দরিদ্র জেলে যারা জীবিকার প্রয়োজনে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়েছিল তাদের কাছে পৌছেছিলো? উত্তরটি আমার জানা নেই। তবে পাঠকদের জন্য আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রের একটি বিকল্প অভিজ্ঞতা জানাতে পারি। ২০০৪ ভারতের তামিলনাড়ু রাজ্যের পন্ডিচেরীর উপকূলবর্তী একটি গ্রামে গিয়েছিলাম। ঐ গ্রামের অধিবাসীদের অধিকাংশ জেলে। সমুদ্রে মাছ ধরেই তারা জীবিকা নির্বাহ করে। সমুদ্রের সামনেই পঞ্চায়েত ভবনে (স্থানীয় সরকার) একটি ইলেকট্রনিক ডিসপ্লে বোর্ড আমাদের সবার নজর

কাড়লো। বোর্ডটির বিশেষত্ব হলো ঐ বোর্ডে প্রতিদিনের আবহাওয়ার সার্বিক অবস্থা লেখা থাকে। প্রত্যন্ত ঐ গ্রামে ইউএস নেভীর ওয়েবসাইট থেকে সমুদ্রের হালনাগাদ অবস্থা ইন্টারনেটের মাধ্যমে ডাউনলোড করে তামিল ভাষায় ঐ বোর্ডে টাঙ্গিয়ে রাখা হয়। জেলেরা ঐ বোর্ড থেকে সমুদ্রের অবস্থা সম্পর্কে জেনে মাছ ধরার জন্য রওনা দেয়। আরো রয়েছে পঞ্চায়েত ভবনের সামনেই একটি উঁচু মাইক। কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ঐ মাইকের মাধ্যমে জনগণকে জানানো হয়। এর সাথে রয়েছে একটি বাতি যা দূর সমুদ্র থেকে দেখা যায়। ঐ বাতি দেখে জেলেরা সমুদ্র থেকে তাদের গ্রাম চিহ্নিত করতে পারে এবং নির্বিঘ্নে ঘরে ফিরতে পারে। সুনামির প্রলয়ংকারী ধ্বংসযজ্ঞের কথা আমাদের সবার জানা। কিন্তু সমুদ্র উপকূলবর্তী পন্ডিচেরীর ছোট্ট এই জেলে অধ্যুষিত গ্রামটির মানুষকে সুনামি ভাসিয়ে নিতে পারেনি। পারেনি ! সেটি কোন দৈব ক্রমে নয় বরং তথ্য প্রযুক্তির কল্যাণে। তথ্য-প্রাপ্তির কল্যাণে ঐ গ্রামে সুনামিতে প্রাণহানির ঘটনা একদম ঘটেনি। কারণ তাদের গ্রামের এক সন্তান সিঙ্গাপুরে বসে ৪ ঘন্টা পূর্বে সুনামির খবর ঐ গ্রামে টেলিফোন করে জানিয়ে দেয়। ৪ ঘন্টা জীবন বাঁচানোর জন্য অনেক সময়। এই সময়ের মধ্যে সবাই প্রাণ নিয়ে গ্রাম ছেড়ে যায়। এ তথ্য তাদের সহায় সম্পত্তি হয়তো রক্ষা করেনি, কিন্তু বাঁচিয়ে ছিলো অগনিত অমূল্যপ্রাণ। তাই গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টির অবতারনা করে লেখাটি শেষ করবো তা হলো, এখন দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে তথ্য প্রযুক্তির নানা মাধ্যম পৌছে গিয়েছে। শুধু দরকার এ মাধ্যমগুলোকে কার্যকরভাবে ব্যবহার করে বঞ্চিত মানুষের প্রয়োজনীয় তথ্যটি সঠিক সময়ে পৌছে দেয়া।

তাই তথ্য অধিকার আইনের মূল স্লোগান হওয়া উচিত 'সবার জন্য সঠিক সময়ে সঠিক তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।'

লেখক : কর্মসূচী পরিচালক, ডি.নেট (ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ নেটওয়ার্ক)।

সুশাসনের জন্য চাই তথ্যের অবাধ প্রবাহ

সাজ্জাদ হুসেইন ও শামীম ইফতেখার

সত্যজিৎ রায় সত্য কথাগুলো সুন্দর করে বলতেন। তার 'হীরক রাজার দেশে' চলচ্চিত্রে হীরক রাজার একটি কথা প্রায়ই কানে বাজে। 'এরা যত বেশি জানে, তত বেশি বোঝে, তত কম মানে'। রাজা বা শাসকদের তথ্য গোপন করার এই মানসিকতা এর চেয়ে সুন্দরভাবে তুলে ধরা কঠিন। হীরক রাজার এই ভয়টিই এখন বাংলাদেশের 'রাজাদের তাড়া করছে। যে কারণেই এ দেশের মানুষের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার এখনো আইনী স্বীকৃতি পায়নি। ইদানিং তথ্য প্রাপ্তির প্রয়োজনীয়তা বা জানার অধিকার নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হচ্ছে। সরকার এবং বিরোধী দলও এর সমর্থনে অনেক বুলি আওড়াচ্ছেন। কিন্তু নিজেরা সেগুলি বিশ্বাস করছেন কি না সেটা বলা মুশকিল।

তথ্য গোপন বা নিয়ন্ত্রণ করার এ প্রবনতা খুবই পুরোনো। ঔপনিবেশিক আমলে অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট (১৯২৩) এখনো দাপটের সঙ্গে রাজত্ব করে যাচ্ছে। ২০০২ সালে বাংলাদেশ আইন কমিশন যখন 'রাইট টু ইনফর্মেশন অ্যাক্ট ২০০২'-এর ওপর একটি কার্যপত্র প্রকাশ করেছিল, তখন অনেকেই আশা করেছিল এবার হয়ত মানুষের তথ্য শূন্যতা কিছুটা হলেও কমবে। সরকারের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও তাদের কাজে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে। কিন্তু সে আশা আজও আলোর মুখ দেখেনি। রাষ্ট্রীয় তথ্যে জনগণের প্রবেশাধিকার এখনো অন্ধকারে রয়ে গেছে।

বাংলাদেশে ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতা প্রত্যাশী রাজনীতিবিদরা জোর গলায় বলেন, বাংলাদেশে গণতন্ত্র বিদ্যমান। গণতন্ত্র যদি হয় জনগণের কল্যাণে জনগণ কর্তৃক পরিচালিত শাসন ব্যবস্থা হয়, তবে সে ব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হয় সর্বাগ্রে। দু:খের বিষয় হলো, পাঁচ বছর পরপর শুধু ব্যালট পেপার সিল মেরেই জনগণের দায়িত্ব শেষ। জনপ্রতিনিধির মাধ্যমে সুশাসন নিশ্চিত করার দাবী করতে যে তথ্য জানার প্রয়োজন, এ দেশের শাসকরা সেটিকে দুষ্প্রাপ্য করে রেখেছে। আর নিরীহ জনগণ কিছু না জেনেই বছরের পর বছর ব্যালট পেপারে সিল মেরে যাচ্ছেন। তথ্যের স্বাধীনতাহীন এই গণতন্ত্রের সঙ্গে স্বৈরতন্ত্রের অমিল

পাওয়া দুষ্কর। টিআইবির রিপোর্ট অনুযায়ী ২০০৩-০৫ সালে সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি যে ১৪৯টি অডিট আপত্তি আলোচনা করেছিল, তার আর্থিক পরিমাণ ছিল ১৩ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে আদায় হয়েছে মাত্র ৬৩ কোটি টাকা। বাকি টাকা কোথায় গেল জনগণ কি সেটা জানে? গত বছর প্রায় তিন কোটি টাকা অপব্যয় হয়েছে মাননীয় সাংসদদের সময়মতো সংসদ অধিবেশনে উপস্থিত না হওয়ার কারণে। তারা দেশের জন্য কাজ করবেন কি, তাদের নিজের জন্যেই সময় যে বড় কম! দেশ শাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত এসব জনপ্রতিনিধির কর্মযজ্ঞ সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানলে নিশ্চয়ই জনগণ সিলটি মারার আগে আরেকবার চিন্তা করত।

সাধারণ মানুষকে জানতে না দিলে গণতন্ত্র তো ব্যহত হয়ই, সুশাসনের ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি হয়, ক্ষতিগ্রস্ত হয় দেশের অর্থনীতি, দরিদ্র মানুষ হয় দরিদ্রতর। সবচেয়ে বড় কথা সাধারণ মানুষ যত কম জানবে, দেশে দুর্নীতির মচ্ছব ততই বাড়বে।

সাধারণ মানুষকে জানতে না দিলে গণতন্ত্র তো ব্যহত হয়ই, সুশাসনের ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি হয়, ক্ষতিগ্রস্ত হয় দেশের অর্থনীতি, দরিদ্র মানুষ হয় দরিদ্রতর। সবচেয়ে বড় কথা সাধারণ মানুষ যত কম জানবে, দেশে দুর্নীতির মচ্ছব ততই বাড়বে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল প্রকাশিত দুর্নীতির ধারণাসূচক ২০০৫ অনুযায়ী, যেসব দেশে তথ্যের অধিকার আইনটি স্বীকৃতি পেয়েছে, সেসব দেশে দুর্নীতি তুলনামূলক কম। এই তালিকায় আছে ফিনল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, ডেনমার্ক প্রভৃতি দেশ। আর মিয়ানমার, চাদ, নাইজেরিয়া কিংবা বাংলাদেশের মত দুর্ভাগা দেশে দুর্নীতির ব্যাপকতা সবচেয়ে বেশি। এর অন্যতম কারণ এসব দেশে তথ্যের স্বাধীনতা নেই। এখানে জনগণের অজান্তে সম্পন্ন হয় জাতীয় স্বার্থবিরোধী বিভিন্ন চুক্তি, সরকারি ক্রয়-বিক্রয়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আইনী সহায়তা–এসব ক্ষেত্রে অনেক সেবাই বিনামূল্যে পাওয়ার কথা, যা বেশিরভাগ মানুষই জানে না। সরকারি সেবকরা জনগণের এই তথ্যহীনতার সুযোগ নিচ্ছেন, করছেন নিজেদের পকেট ভারি। দেশের মানুষকে দুর্নীতি নামক এ ব্যাধি থেকে মুক্ত করতে হলে তথ্য নামক প্রতিষেধকটির প্রয়োজন সবার আগে।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পূর্বশর্ত অবশ্যই রাষ্ট্রীয় সব তথ্যে জনগণের অধিকার। সে অনুযায়ী জনগণের তথ্য জানার অধিকার সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত। বাংলাদেশ জাতিসংঘের 'মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র'-এ স্বাক্ষর করেছে। এ ঘোষণাপত্রে যে কোন মাধ্যমে তথ্য ও চিন্তার সন্ধান করা, পাওয়া এবং অন্যের কাছে পৌঁছে দেওয়ার অধিকারের কথা বলা হয়েছে। বাংলাদেশ জন্মনিয়ন্ত্রণ, ডায়রিয়ায় শিশু মৃত্যুও হার রোধে যে সাফল্য অর্জন করেছে, তার মূল কারণই কিন্তু এ সংক্রান্ত তথ্যের ব্যাপক প্রচার। অমর্ত্য সেন দুর্ভিক্ষের কারণ হিসেবে খাদ্য ঘাটতির চেয়ে তথ্যের অপ্রতুলতাকেই বেশি দায়ী করেছেন। বিশ্বব্যাপি আজ যে গ্লোবাল ভিলেজ ধারণার জয়জয়কার চলছে, তার মূল চালিকা শক্তিও কিন্তু তথ্যের অবাধ প্রবাহ। এ কথাগুলো আমাদের শাসক, রাজনীতিবিদ সবাই জানেন। কিন্তু হীরক রাজার ভয় থেকে তারা মুক্ত হবেন কীভাবে।

হীরক রাজার চেয়ে বরং আমাদের রাজাদের ভয় খানিক বেশি। এরা নিজেরা তো তথ্য প্রদান করেনই না, অন্য কেউ যদি জোগাড় যন্ত্র করে তথ্য উদঘাটন করেন তাহলে তারা তাকে কাল্পনিক, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে আস্ফালন করতে থাকেন।

হীরক রাজার চেয়ে বরং আমাদের রাজাদের ভয় খানিক বেশি। এরা নিজেরা তো তথ্য প্রদান করেনই না, অন্য কেউ যদি জোগাড় যন্ত্র করে তথ্য উদঘাটন করেন তাহলে তারা তাকে কাল্পনিক, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে আস্ফালন করতে থাকেন। গণমাধ্যম বিশেষ করে সংবাদপত্রগুলোতে যখন বাংলাভাই ও জঙ্গিবাদ সম্পর্কে খবর প্রকাশিত হয়েছিল, তখন শাসকরা একে কল্পনাপ্রসূত বলতেও কার্পণ্য করেননি। এর খেসারত দিতে হয়েছে ৬৩ টি জেলার অসংখ্য মানুষকে। এ দেশে তথ্যের স্বাধীনতার চেয়ে আরো ভয়ঙ্কর বিষয় হলো, তথ্যকে অস্বীকার করার সংস্কৃতি। আর তথ্য বিকৃত করার বিষয়টি নাইবা বলা হলো। সরকার নিয়ন্ত্রিত গণমাধ্যমগুলোর দিকে চোখ রাখলেই সেটি স্পষ্ট হয়।

আশার কথা ইদানিং বেসরকারি গণমাধ্যমগুলো তথ্য প্রচারে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করছে। ফুলবাড়ী, কানসাট, শনির আখড়ার ঘটনায় জনগণের যে বিজয়

তাতে গণমাধ্যম যথাযথ ভূমিকা রেখেছে নিঃসন্দেহে। কিন্তু তাদের কাজটিও নিবিঘ্নে করা সম্ভব হচ্ছে না। এ দেশে ২০০৫ সালে তিনজন সাংবাদিক খুন হয়েছেন, শারীরিক নিপিড়নের শিকার হয়েছেন ১৩৩ জন এবং মৃত্যুর হুমকির শিকার হয়েছেন ১৬৪ জন। রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার এবং কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্টের মতে, বাংলাদেশ সংবাদকর্মীদের জন্য এশিয়ার সবচেয়ে বিপজ্জনক স্থান। এর সঙ্গে দায়িত্ব পালনে বিভিন্ন বাধা তো আছেই। এ বাধা দূর করে তাদের যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করতে দেওয়া দেশের জন্য জরুরী। তথ্য জানার অধিকারটি সে কারণেও প্রয়োজন।

লেখাটি শুরু হয়েছিল একটি চলচ্চিত্রের কথা দিয়ে। শেষ করতে হচ্ছে একটি মর্মান্তিক বাস্তবতার মাধ্যমে। ২০ সেপ্টেম্বর রাতে সামুদ্রিক ঝড়ে প্রায় এক হাজার বাংলাদেশি জেলে সাগরে নিখোজ হয়েছেন। সাগরে যাওয়ার আগে ঝড়ের তথ্যটি কি তাদের জানা ছিল? বাংলাদেশের মানুষের তথ্য জানার অধিকার কোন আইনের দ্বারা স্বীকৃত নয়। এ অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে বিশ্বের অনেক দেশের সঙ্গে বাংলাদেশেও আজ (২৮ সেপ্টেম্বর ২০০৬) তথ্য অধিকার দিবস পালিত হচ্ছে। দেশের জনগণ আজ তথ্যের অজ্ঞতা থেকে মুক্তি চায়, চায় তথ্য জানার অধিকারের আইনি স্বীকৃতি। সে আইনটি কি আমরা সহসা পাব?

লেখক : ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ-এ কর্মরত।
সূত্র : প্রথম আলো, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০০৬।

তথ্য অধিকার আইন

ভারতের অর্থলোলুপ কর্মকর্তাদের মাঝে আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে

গৃহ প্রস্তুতকারী ৫৫ বছর বয়সী নান্নুলাল সরকারি রেশন কার্ডটি হারিয়ে ফেলায় তার স্ত্রী ও সন্তানের মুখে ভাত তুলে দিতে তার দ্বিগুণ অর্থ খরচ হতে লাগল। এই কার্ডটি দিয়ে সে সপ্তাহের চাল ডাল আটা কম দামে কিনতে পারতো। কার্ডটি ফিরে পাওয়ার জন্য সে মরিয়া হয়ে উঠল। কিন্তু ভারতের যেকোন অফিস থেকে দলিলের মত সামান্য কোন জিনিস পেতে হলেও আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা অতিক্রম করতে হয়। প্রতিষ্ঠিত কিছু দুর্নীতিগ্রস্ত অফিসার ঘুষ নেওয়ার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে এ ধরনের জটিলতা তৈরি করে রাখে।

যে কাজের জন্য ১০ দিন লাগা উচিৎ সেখানে অফিসগুলির মধ্যে কাজের জটিলতার কারণে তিন মাস সময় লেগে যায়। লাল সৌভাগ্যক্রমে একটি স্থানীয় এনজিও এর সহায়তা পেল এবং সে সদ্য প্রণীত 'তথ্যের অধিকার' আইনের আওতায় আবেদন নথিভূক্ত করল রেশন কার্ড পাওয়ার জন্য। পরদিন সে সিনিয়র অফিসারের রুমে চায়ের জন্য আমন্ত্রিত হলো এবং রেশন কার্ডটি হাতে পেল।

দৈনিক ২০০ রুপি আয় করে নয়াদিল্লির একটি বস্তিতে বসবাসকারী লাল বলে, তথ্যের অধিকার আইন তার জন্য যাদুর দন্ডের মত। তিনি আরো জানান যে, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা আমার কাছে ১০০ রুপি ঘুষ চেয়েছিল যা দিতে আমি অস্বীকৃতি জানিয়েছিলাম। আরটিআই না থাকলে আমি কখনই এই রেশন কার্ডটি ফেরত পেতাম না।

গত অক্টোবর ২০০৫-এ প্রণীত নতুন আইনটি ভারতের হাজার হাজার মানুষকে স্থানীয় অলস, দুর্নীতিবাজ আমলাদের বিরুদ্ধে লড়তে সহায়তা করবে সচরাচর যারা 'বাবু' নামে পরিচিত। 'পরিবর্তন' নামে একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রচারকর্মী মনীষ সিসোডিয়া বললেন, 'এই আইন ঐ সমস্ত অফিসারদের মধ্যে ভীতির সৃষ্টি করেছে'।

তিনি বললেন, আমরা বলি গণতন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করে সাধারণ মানুষ। কিন্তু সাধারণত তা খুবই কম হয়ে থাকে। তথ্যে অধিকার আইন সেরকমই সুযোগ করে দিয়েছে।

তাদেরকে যেকোন নথি, তথ্য, জানার ক্ষমতা দিয়েছে। যে কোন দরজা খুলতে পারি আমরা এখন। এই আইন দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কার্যকর হাতিয়ার হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে, যদিও ভারত থেকে হয়তবা কোনদিন দুর্নীতি চলে যাবে না।

সরকার পশ্চাদমুখী ?

এই আইন ভারতীয় নাগরিকদের জাতীয় নিরাপত্তা, ক্যাবিনেট পেপারস এবং কোর্ট দ্বারা সংরক্ষিত কিছু তথ্য ছাড়া আমলাদের কাছে যে কোন বিষয়ে জানার অধিকার দিয়েছে। তারা ১০ রুপি ফি প্রদান সাপেক্ষে কর্মকর্তাদের কাছ থেকে পাসপোর্ট, ড্রাইভিং লাইসেন্স, ভোটার আইডি কার্ড, পানি ও বিদ্যুৎ সংক্রান্ত যাবতীয় আবেদনের পরিণতি সম্পর্কে তথ্য পাওয়ার অধিকার রাখেন।

তথ্য সংক্রান্ত আবেদনের উত্তর যদি ৩০ দিনের মধ্যে না পাওযা যায় তাহলে তার বিরুদ্ধে আপিল করা যাবে এবং পরের মাসেও উক্ত কর্মকর্তা তথ্য জানাতে ব্যর্থ হলে দিন প্রতি ২৫০ রুপি হারে জরিমানা প্রদান করবেন। এই জরিমানা সর্বোচ্চ ২৫০০ রুপি পর্যন্ত হতে পারে । উক্ত কর্মকর্তার বেতন থেকেও জরিমানা কর্তন হতে পারে এবং যদি কোন কর্মকর্তা মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করে তাহলেও শাস্তি স্বরূপ ২৫০০০ রুপি অথবা সমপরিমান অর্থ তার বেতন থেকে কর্তন করা হবে।

আলোচ্য আইন সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য অতি কঠোর হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। সরকারি কর্মকর্তাদের বিভিন্ন সময় ফাইলের উপর অনেক ধরনের মন্তব্য নোট আকারে লিখে রাখতে হয়। এসব দেখা থেকে আবেদনকারীদের নিরস্ত্র করতে সরকার নতুন আইনে সংশোধনীর চিন্তা করেছে।

তবে সরকারী কর্মকর্তা এবং এনজিও কর্মীদের মধ্যে সম্ভাব্য সংশোধনীর ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক মনোভাব রয়েছে। এ্যাক্টিভিস্টরা মনে করেন কি দেখা যাবে আর কি দেখা যাবে না সেটার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা না থাকলে আইনের ক্ষমতা খর্ব হতে পারে।

'পরিবর্তন' এর প্রতিষ্ঠাতা অরবিন্দ কেজারিওয়াল বলেন, কোন কিছু অনুমোদিত হবে না বাতিল হবে তা নির্ভর করে সরকারী কর্মকর্তাদের ফাইল নোটের ওপর ভিত্তি করে। তারা যেকোন অফিসিয়াল তথ্যাবলীর সমন্বয় করে থাকেন। যদি কেউ তার পাসপোর্ট কেন দেওয়া হচ্ছে না সে সম্পর্কে জানতে চান তাহলে নোট

প্রদর্শন করতে ব্যর্থ হলে সে তথ্য জানতে পারবে না।

তথ্যের অধিকার বিষয়ে তৃণমূল পর্যায়ে প্রচারের জন্য কাজারিওয়াল এ বছর ফিলিপাইন ভিত্তিক র‍্যামন ম্যাগসেসে এ্যাওয়ার্ড বিজয়ী হয়েছেন।

দরিদ্র থেকে ধনী

বৈশ্বিক দুর্নীতি পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা ট্রান্সপারেন্সী ইন্টারন্যাশনাল এর মতে ২০০৫ সালে দুর্নীতিগ্রস্ত ১৫৮ টি দেশের মধ্যে ভারতের অবস্থান ৮৮ তম। এই বছরের ট্রান্সপারেন্সী'র জরিপ থেকে দেখা গেছে এর আগে ভারত দুর্নীতির দিক থেকে ইন্দোনেশিয়া ও মেক্সিকো এর পাশাপশি অবস্থান করছিল। শতকরা ২০ ভাগ পরিবার বলেছে তারা গত ১২ মাসে কমপক্ষে একবার ঘুষ দিয়েছে।

ভারতের শীর্ষ অপরাধ দমন এজেন্সির কেন্দ্রীয় তদন্ত দপ্তর ২০০৩ থেকে ঘোষনা করেছে তারা দুর্নীতি দমনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। সেখানে এ বছরের জুন পর্যন্ত তারা প্রায় ৩০০০ মামলা রেজিষ্ট্রি করেছে। কেজারিওয়াল বলেছেন, 'মামলার সংখ্যা গুরুত্বপূর্ণ নয়, গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে কত লোক এর থেকে সাজা পাচ্ছে। ভারতে এই সাজা প্রাপ্তের হার শতকরা ৫ ভাগেরও কম-যা খুবই বিপদজনক।'

নতুন আইন প্রণয়নের জন্য ৭০০ চাপ প্রয়োগকারী দল এবং সেবামূলক প্রতিষ্ঠান জুলাই এর প্রথম থেকে জনগণকে তার অধিকার সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করে। ৪৭টি শহরে ১৫০০ স্বেচ্ছাসেবক সরকারি অফিসগুলিতে তথ্যকেন্দ্র স্থাপন করে। যেখানে ১৪ হাজারেরও বেশি দরখাস্ত নথিভুক্ত হয়।

পরির্বতনের ২২ বছর বয়সী প্রচারকর্মী সন্তোষ কুমারি বলেন এখন এমন একটা পর্যায় এসেছে যে, সরকারী কর্মকর্তারা আমাদের কাছে অনুরোধ করেছেন যে অভিযোগসমূহ এখন থেকে আরটিআই এর কাছে নথিভুক্ত করার প্রয়োজন নেই। আমরাই অভিযোগসমূহের দ্রুত নিষ্পত্তির প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

সূত্র : The Daily Star, আগস্ট ১২, ২০০৬।

দক্ষিণ এশিয়ায় তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার

ড: গোলাম রহমান

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদ, ১৯৪৮-এর ১৯তম অনুচ্ছেদে তথ্যপ্রাপ্তির অধিকারকে মানবাধিকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও এ অধিকারটি নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক কনভেনশন, ১৯৬৬- যে কনভেনশনে স্বাক্ষরদাতাদের মধ্যে বাংলাদেশও রয়েছে, সেটির ১৯(২) নং অনুচ্ছেদের পরিপূরক। জনগণের তথ্য জানার অধিকারকে সরাসরি স্বীকৃতি দেওয়ার মত কোন আইন আমাদের দেশে নেই। অপরপক্ষে, বিদ্যমান অফিসিয়াল সিক্রেটস্ অ্যাক্ট, ১৯২৩ তার সর্বশক্তি প্রয়োগ করছে গণমানুষকে তাদের তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করার প্রয়াসে।

বাংলাদেশের আইন বা সংবিধানে এমন কোন ধারা/ অনুবিধি নেই যাতে তথ্য পাওয়ার অধিকার বা স্বাধীনতার বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখিত আছে। তবে এ বিষয়টি অনুল্লেখিত রয়েছে বলে সেটিকে তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নেতিবাচক হিসেবে দেখার উপায় নেই। কেননা, সংবিধানের ৩৯(২) অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যায় আলোচনা ও প্রচারের স্বাধীনতার কথা বলা আছে। বিশেষত বর্তমান সময়ে যখন সমগ্র বিশ্বজুড়ে তথ্য অধিকারকে গণতন্ত্র এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে–সেখানে বাংলাদেশের পরিস্থিতি ও এর ব্যতিক্রম নয়।

'অফিসিয়াল সিক্রেটস্ অ্যাক্ট' এর মত অন্যান্য যেসব আইন বা বিধান 'জাতীয় নিরাপত্তা'র জন্য প্রণীত হয়েছে, সেগুলো রাষ্ট্রের নাগরিকদের তথ্যপ্রাপ্তির অধিকারকে দারুণভাবে বাধাগ্রস্থ করে। এসব বিধানের কারণে এদেশে জাতীয় পর্যায়ে এক ধরনের গোপণীয়তার সংস্কৃতির চর্চা চলছে এবং জনসাধারণকে তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে সরকারি কর্মকর্তাদের মনে ব্যাপক অনীহার সৃষ্টি হয়েছে।' (দিল্লীতে ১৯৯৯ সালে অনুষ্ঠিত 'দক্ষিণ এশিয়ার তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার, কমনওয়েলথ্ মানবাধিকার পদক্ষেপ' শীর্ষক আলোচনা প্রতিবেদন থেকে উদ্ধৃত)। ভারতে অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, দক্ষিণ এশিয়

দেশগুলোর সংবিধান সে ধরনের আন্দোলনের যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠা এবং আন্দোলনকে বৈধতা দেয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রাখতে সক্ষম। ভারতে তথ্য অধিকার বিষয়েক যে বিলটি ২০০৪ সালের ২২ ডিসেম্বর অনুমোদিত হয় সেটিতে সে দেশের রাষ্ট্রপতি ১৫ জুন, ২০০৫-এর স্বাক্ষর করেছেন (সূত্র: প্রথম আলো-তে প্রকাশিত প্রাসঙ্গিক প্রতিবেদন, ৩০ আগস্ট ২০০৬)।

তথ্যে প্রবেশাধিকার মানুষের একটি মৌলিক অধিকার, যা কিনা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, জনগণের ক্ষমতায়ন ও সর্বস্তরে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের পূর্বশর্ত। নেপালের সংবিধানে জনগণের তথ্যে প্রবেশাধিকার এবং তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার সংরক্ষিত। সংবিধানে ১৯৯১ সালে তথ্য অধিকারের বিষয়টি সংযুক্ত করার পর নেপালের জনগণ এ অধিকার অর্জন করে, যা সম্ভব হয় সেদেশে ১৯৯০ সালে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ফলে। সংবিধনের ৩য় অধ্যায়ে বর্ণিত মৌলিক অধিকারগুলো হচ্ছে: সমঅধিকার, গণআধিকার, গণমাধ্যম ও প্রকাশনার স্বাধীনতা, তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার, গোপনীয়তার অধিকার, সংবিধান সংশোধনের অধিকার ইত্যাদি। অনুচ্ছেদ ১৬-তে বলা আছে, 'প্রত্যেক নাগরিককেরই জনগুরুত্বপূর্ণ যে কোনো বিষয়ে তথ্য চাওয়া এবং পাওয়ার অধিকার থাকবে.....'।

পাকিস্তানে তথ্য অধিকার ছিল না, কিন্তু, নব্বই-এর গোড়ার দিকে তথ্য স্বাধীনতার জন্য জোরদার আন্দোলন শুরু হয়। আন্দোলনের মূল নায়ক ছিলেন সিনেটর অধ্যাপক খুরশীদ আহমেদ, যিনি এ বিষয়ের ওপর একটি প্রাইভেট বিল পেশ করেন। বিলটি নিয়ে খুব স্বল্পসময়ের জন্য বিতর্কের সুযোগ দেয়া হয় এবং শেষ পর্যন্ত স্ট্যান্ডিং কমিটি ১৯৯২ সালে একটি প্রতিবেদনের মাধ্যমে বিলটি খারিজ করে দেয়। পরবর্তীকালে পাকিস্তান সরকার ২০০২ সালের ২৭ অক্টোবর ' তথ্য স্বাধীনতা অধ্যাদেশ' জারি করে। সাউথ এশিয়ান জার্নাল-এর একজন নির্বাহী সম্পাদক লিখেছেন, "অধ্যাদেশ ২০০২ যতটা না জনক্ষমতায়নের সহায়ক তার চেয়ে বেশী সীমাবদ্ধতা সৃষ্টিকারী, যা দেশের সাধারণ নাগরিকদের তথ্যপ্রাপ্তির অধিকারকে সীমিত করে দিচ্ছে"। ("পাকিস্তান : এক্সেস টু ইনফরমেনশন", জার্নালিস্টস বিয়ন্ড ফ্রন্টিয়ার্স, ঢাকা, সাফমা, নভেম্বর ১০-১১,২০০৫)

শ্রীলঙ্কার সংবিধানে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা বা তথ্যে প্রবেশাধিকার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো নিদের্শনা নেই। এর অধিকার সংক্রান্ত বিলের অংশ হিসেবে সংবিধানের

৩য় অধ্যায়ের অনুচ্ছেদ (১৪) (এ)-এর সাধারণ শর্তাবলী অনুযায়ী মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে। এতে বলা আছে, "সকল নাগরিকেরই বাক্‌-স্বাধীনতা এবং মত প্রকাশের (প্রকাশনাসহ) স্বাধীনতা রয়েছে। কিন্তু, এই স্বাধীনতা চূড়ান্ত নয়।" একজন গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞের বক্তব্য হচ্ছে, সংবিধানে একদিকে যখন "বাক্‌-স্বাধীনতা এবং প্রকাশনাসহ মত প্রকাশের সবরকম স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে, তখন অন্যদিকে আবার এই মৌলিক অধিকারের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।"

"সরকার গোপনীয়তাকে রাষ্ট্রের নীতিতে পরিণত করার বিষয়টির যৌক্তিকতা প্রতিপাদন করতে ব্যর্থ হবে এবং 'স্বচ্ছতা বলতে আমরা নথিপত্র উন্মুক্তকরণকে নয়, বরং উন্মুক্ত রাষ্ট্র পরিচালনা প্রক্রিয়াকে বুঝি।"

শ্রীলঙ্কায় ৭০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে শিক্ষার হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনে যে উন্নয়ন সংঘটিত হয় তার ফলে সুশীল সমাজ, সংগঠন, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধিজীবী, রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী ও সচেতন নাগরিকদের মধ্যে অধিকতর স্বাধীনতা লাভ তথা নাগরিক স্বাধীনতা অর্জনের বিষয়ে ব্যাপক সাড়া জাগে।

সমন্বিত খসড়া আইন প্রণেতার ভাষায়, 'এমন একটি আইন যার কাজ হবে সরকারি কর্মকর্তার কাছে সংরক্ষিত সবরকম তথ্য সকল নাগরিকের পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করা, যে সব তথ্যের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কিছু ব্যতিক্রম ও সীমাবদ্ধতা রয়েছে সেগুলোকে সহজলভ্য করার প্রক্রিয়া নির্ধারণ করা, সরকারি কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও বাধ্যবাধকতা নিরূপণ করা এবং এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বা প্রাসঙ্গিক সকল বিষয়ের প্রতি নজর দেওয়া।' দেখা গেছে যে, শ্রীলঙ্কায় তথ্য অধিকার বিষয়ক আলোচনা এখনো প্রারম্ভিক পর্যায়ে রয়েছে।

বাংলাদেশে খসড়া আইনটি তৈরী করা হয় আইন কমিশন প্রণীত প্রস্তাবিত তথ্য অধিকার আইন ২০০২ বিষয়ক একটি কর্মপত্রের ওপর ভিত্তি করে। 'তথ্য অধিকার'-এর সংজ্ঞা সম্পর্কে খসড়া আইনে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক নাগরিকেরই অধিকার আছে কোনো সরকারি কর্মকর্তার কাছে সংরক্ষিত বা উক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক

নিয়ন্ত্রিত তথ্য পাওয়ার। একটি দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকের মতে, "সরকার গোপনীয়তাকে রাষ্ট্রের নীতিতে পরিণত করার বিষয়টির যৌক্তিকতা প্রতিপাদন করতে ব্যর্থ হবে এবং 'স্বচ্ছতা বলতে আমরা নথিপত্র উন্মুক্তকরণকে নয়, বরং উন্মুক্ত রাষ্ট্র পরিচালনা প্রক্রিয়াকে বুঝি।"

দেখা গেছে যে, গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করা এবং প্রশাসনের স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দুর্নীতি রোধ করার ক্ষেত্রে তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম। তথ্য অধিকার আইনটি অতিশীঘ্র বিধিবদ্ধ করানোর লক্ষ্যে দেশজুড়ে গণআন্দোলন গড়ে তোলা জরুরি। এছাড়া রাজনৈতিক দলগুলোর উচিত এ আইন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিষয়টিকে তাদের নির্বাচনী ইশতেহার এবং দলীয় কার্যক্রমের অন্তর্ভূক্ত করা।

সর্বোপরি বলা যায়, দক্ষিণ এশিয়ার সামগ্রিক পরিস্থিতি পর্যালোচনায় যে কোনো সচেতন নাগরিকই এ বিষয়টি উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন যে, তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে শুধু যে গণমাধ্যমগুলোই উপকৃত হবে তা নয়; এতে করে জনগণের ক্ষমতায়নের বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পাশাপাশি প্রতিটি দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নও সম্ভব হবে।

লেখক : অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

তথ্যের অধিকার বনাম ব্যবসায়িক স্বার্থ

আহমেদ স্বপন মাহমুদ

পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্বায়নের যুগে প্রচার মাধ্যমের ভূমিকা যে খুবই শক্তিশালী তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু কথা থাকে যে, প্রচার মাধ্যম কি সত্যিই সমাজে সর্বস্তরে যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারছে? যদি তা না হয়, তাহলে আমাদের খতিয়ে দেখতে হবে কেন তা পারছে না, সমস্যাটা কোথায়? এছাড়া এ-ও আমাদের বিশ্লেষণ করতে হবে এ প্রচার মাধ্যম কাদের হাতে, এর নিয়ন্ত্রণ কারা করছে, তাদের আসল উদ্দেশ্যই বা কী? এসব প্রশ্নের উত্তর যদি আমরা বের করেতে না পারি তাহলে প্রচার মাধ্যম থেকে আমরা কী চাই তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় থেকে যায়।

বলা হয়ে থাকে, প্রচার মাধ্যম যোগাযোগ, সমাজ উন্নয়ন, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, সচেতনতা বৃদ্ধি, শিক্ষা, গণতন্ত্রের বিকাশ ইত্যাদি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে। প্রচার মাধ্যমের এ ধরনের ভূমিকাতো আছেই। কিন্তু বাস্তবে কতটুকু ভূমিকা রাখতে পারছে তা খতিয়ে দেখা জরুরি। কার পক্ষে প্রচার মাধ্যম কাজ করছে–শাসক শ্রেণীর পক্ষে না শোষিতের পক্ষে? প্রচার মাধ্যমের কোন নিয়ন্ত্রণ কি জনগণের হাতে আছে? যার নিয়ন্ত্রণ জনগণের হাতে বা যে মাধ্যমে জনঅংশগ্রহণ নেই বা সুযোগ নেই, তা কি আদৌ জনগণের কাজে আসে? উদাহরণস্বরূপ, 'যদি প্রচার মাধ্যমের (পত্রিকা, রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদি) নিয়ন্ত্রণ ও মালিকানার কথা বলি তাহলে দেখা যায়, এগুলো নিয়ন্ত্রণ করছে সরকার এবং ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো। বাংলাদেশের প্রচার মাধ্যমের অবস্থা তথা স্বাধীন মতামত প্রকাশ ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার, যোগাযেগের অধিকার ইত্যাদি আশাপ্রদ নয়। কারণ এসব মাধ্যমে কোন ক্ষেত্রেই জনগণের অংশীদারীত্ব নেই, নিয়ন্ত্রণভার নেই। একদিকে বাংলদেশ বেতার ও টেলিভিশনের নিয়ন্ত্রণ, কলাকৌশল, ব্যবস্থাপনা সরকারের হাতে। টেলিভিশনের স্বায়ত্বশাসনের কথা নির্বাচনী ইশতেহারে থাকলেও, মুখে বললেও কোন সরকারই তা বাস্তবায়ন করেনি। কারণ ক্ষমতা ও শক্তির নিয়ন্ত্রণের প্রতীক হিসেবে রেডিও টেলিভিশনকে দেখা হয়। ফলে সরকারের ইচ্ছা-অনিচ্ছাই এতে প্রতিফলিত হয়, সরকারের গুণগানই মূল কার্যক্রম। জনঅংশগ্রহণের কথা, জনগণের চাহিদা মাফিক কার্যক্রম খুব কমই প্রচার করা হয়ে থাকে। এছাড়া বেসরকারি নিয়ন্ত্রণে

আছে একটি রেডিও চ্যানেল এবং বেশ কটি টেরেস্ট্রিয়াল,টেলিভিশন সম্প্রচার চ্যানেল। ব্যাপক জনগোষ্ঠীর স্বার্থের বা জনঅধিকার নিয়ে এসব চ্যানেল কদাচিৎ কথা বলে। কর্পোরেট পুঁজির দাপটে বিজ্ঞাপন নামক মসলা আর শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য সুড়সুড়ি মার্কা নাট্য খোরাক ছাড়া এসব চ্যানেল থেকে খুব একটা কিছু পাওয়া যায় না।

সংবাদপত্রের মালিকানা, ব্যবস্থাপনা, নিয়ন্ত্রণ কৌশল এবং প্রকাশনা রীতিনীতি ইত্যাদি সম্পূর্ণ মালিক-কর্তৃপক্ষের হাতে। কেননা এগুলো ব্যবসায়িক প্রচার মাধ্যম, মূল উদ্দেশ্য জনস্বার্থ নয়, সমাজে যশ ও ক্ষমতার লড়াইকে উন্মুক্ত করা। মুক্তবাজার অথনীতির এটি আরেক মাজেজা।

সংবাদপত্রের কথা যদি বিবেচনা করি, তাহলে এর চিত্রও কম ভয়াবহ নয়। সংবাদপত্রের মালিকানা, ব্যবস্থাপনা, নিয়ন্ত্রণ কৌশল এবং প্রকাশনা রীতিনীতি ইত্যাদি সম্পূর্ণ মালিক-কর্তৃপক্ষের হাতে। কেননা এগুলো ব্যবসায়িক প্রচার মাধ্যম, মূল উদ্দেশ্য জনস্বার্থ নয়, সমাজে যশ ও ক্ষমতার লড়াইকে উন্মুক্ত করা। মুক্তবাজার অথনীতির এটি আরেক মাজেজা। ফলে অধিকাংশ জনগণের স্বার্থে প্রচার মাধ্যমের ভূমিকা সম্পর্কে আমাদের ভাবতে হবে। দেখতে হবে বিকল্প মিডিয়া কী হতে পারে যাতে জনঅংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়, তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত হয়। বিকল্প হিসেবে এখনো কমিউনিটি মিডিয়াগুলো অর্থাৎ জনগণের নিজস্ব যোগাযোগ মাধ্যমগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। যেমন: পুঁথি, পট, কবিগান, যাত্রাপালা, পথনাটক, গণসংস্কৃতি ইত্যাদি। এছাড়াও আমরা কমিউনিটি রেডিও, কমিউনিটি টেলিভিশন ইত্যাদির প্রচলন করে জনগণের জীবন-জীবিকার সঙ্গে সম্পৃক্ত বিষয়-আশয়সহ তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারি।

যেহেতু পত্রিকাগুলো, সম্প্রচার মাধ্যম চলে যাচ্ছে ব্যবসায়ীদের হাতে, ফলে মাল্টি ন্যাশনাল বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তিরাই মালিক-সম্পাদক সেজে এসব মাধ্যম পরিচালিত করছেন। উন্নয়ন বা সমাজ বিকাশের ধারায় প্রচার মাধ্যমের ইতিবাচক ভূমিকাও সংকীর্ণ হয়ে পড়ছে তুলনামূলকভাবে। এখন হেন বিষয় নেই যা পত্রিকায়

ছাপা হচ্ছে না, যা বিজ্ঞাপনের আওতায় নয়। কেননা সব ধরনের পাঠকের, দর্শক-শ্রোতার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করা চাই। বেশি কাটতি চাই, বেশি প্রচার চাই, বেশি মুনাফা চাই, ক্ষমতা চাই, শক্তি চাই–ইত্যাদি কত কিছু প্রয়োজন ব্যবসায়ীদের, ক্ষমতাশালীদের, ধনীদের –যারা এসব মাধ্যম নিয়ন্ত্রণ করেন। এখন তো পত্রিকারও জন্মবার্ষিকী পালিত হয়, ব্যবসায়িক কারণে কোন পত্রিকার সর্বোচ্চ কাটতি এসব তো বাহারি ভাষায় পরিবেশন হচ্ছে প্রতিদিন। আর বিজ্ঞাপন বলা বাহুল্য, সারা অঙ্গজুড়ে সে যা বাহার! তাহলে জনগণের প্রত্যাশা বা চাহিদা যাথাযথভাবে কীভাবে পূরণ হবে?

এরকম প্রেক্ষাপটে প্রচার মাধ্যম কীভাবে জনগণের অধিক উপকারে আসতে পারে, বা সমাজ উন্নয়নে সচেতনতা বৃদ্ধি, শিক্ষা বিস্তার, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ও গনতন্ত্র বিকাশে কীভাবে আরো শক্তিশালি ভূমিকা রাখতে পারে তা বিবেচ্য বিষয়। শাসন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা এবং গণতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণের প্রশ্নেও প্রচার মাধ্যমগুলো গণমূখী ভূমিকা রাখতে পারে। বিদ্যমান সীমাবদ্ধতাগুলো উতরানো আবশ্যক। রেডিও, টেলিভিশন, পত্রিকা সবক্ষেত্রেই সুস্থ বিকাশ প্রয়োজন, তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে এদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর তথ্যপ্রাপ্তি তো জনগণের সাংবিধানিক অধিকার। জনঅধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে, সুস্থ সাংবাদিকতার বিকাশের স্বার্থে, পেশাদারিত্বের স্বার্থে পুঁজির দাসত্বের হাত থেকে প্রচার মাধ্যমকে মুক্ত করা অতি দরকার। জনগণের চাহিদাকে গুরুত্ব দিয়ে ব্যবস্থাপনা, পরিকল্পনা ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে জনঅংশগ্রহণ নিশ্চিত করা অত্যন্ত প্রয়োজন। প্রয়োজন জণগণের ব্যবস্থাপনায় গ্রামীণ সম্প্রচার। হতে পারে কমিউনিটি টেলিভিশন, কমিউনিটি রেডিও, কমিউনিটি ব্যবস্থাপনায় পত্রিকা ও অন্যান্য গণমাধ্যমের সম্প্রসারণ। আর না হয় মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানির ব্যবসা আর পত্রিকার ব্যবসার মধ্যে এখন সামান্য যে পার্থক্য রয়েছে তাও অদূর ভবিষ্যতে থাকবে না।

সূত্র : সমকাল, ৪ মে, ২০০৬।

তথ্য অধিকার গণতন্ত্র ও সুশাসনের প্রাণ

অমিত রঞ্জন দে

তথ্য গণতন্ত্রের প্রাণ। কিন্তু দেশের চলমান ব্যবস্থায় অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত না থাকায় সুশাসন তথা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ব্যাহত হচ্ছে, মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে, দুর্নীতি লাগামহীনভাবে বেড়ে যাচ্ছে। অথচ গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে এবং জীবনকে মর্যাদাপূর্ণ করতে যা কিছু দরকার একজন নাগরিক হিসেবে তার সবকিছু জানার অধিকার রয়েছে। বর্তমানে দেশে এ বিষয়ে রাষ্ট্রীয়ভাবে ইতিবাচক কোন আইন বিদ্যমান নেই বরং এমন কিছু আইন রয়েছে যা তথ্য অধিকারকে সংকুচিত করে। ফলে দেশ হিসেবে আমরা পিছিয়ে পড়ছি, সামগ্রিক উন্নয়ন হচ্ছে বাধাগ্রস্ত।

বাংলাদেশে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থ চরিতার্থ করার লক্ষ্যে ১৯২৩ সালে 'অফিসিয়াল সিক্রেসি অ্যাক্ট'-এর প্রবর্তন করে। জনগণের কাছে তথ্য গোপন রেখে অন্ধকার পথে তারা এদেশে থেকে সম্পদ লুণ্ঠন করেছে। কিন্তু ব্রিটিশরা এদেশ ছেড়ে চলে গেছে। অবসান ঘটেছে পাকিস্তানী শাসন ব্যবস্থারও। দেশ এখন স্বাধীন। অথচ ব্রিটিশ প্রবর্তিত 'অফিসিয়াল সিক্রেসি অ্যাক্ট' এখনো জগদ্দল পাথরের মত আমাদের ঘাড়ে চেপে আছে।

জীবনকে প্রভাবিত করে এমন অনেক বিষয় নাগরিক হিসেবে আমরা জানতে পারি না। নাগরিকদের তথ্য প্রাপ্তির অধিকারকে সরাসরি প্রতিফলিত করতে পারে রাষ্ট্রীয়ভাবে এমন কোন আইন বর্তমানে বিদ্যমান নেই বরং এমন কিছু আইন রয়েছে যা এ অধিকারকে সঙ্কুচিত করে। দেশের যে জনগণ এবং যাদের জন্য রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রবর্তন তারা যদি তথ্য প্রাপ্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় তাহলে স্বচ্ছতা বা জবাবদিহিতার বিষয়টি কোথা থেকে কিভাবে বাস্তবায়িত হবে, কে করবে, কিসের ভিত্তিতে করবে?

সরকার দেশের উন্নয়নে কোথায় কী ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করছে, সে উদ্যোগ যথাযথভাবে গ্রহণ করছে কি না এবং সেগুলি বাস্তবায়িত হচ্ছে কি হচ্ছে না তা 'অফিসিয়াল সিক্রেসি অ্যাক্ট' এর দোহাই দিয়ে গোপন রাখা হচ্ছে। এই সুযোগে

শুধু লোকসানের অজুহাতে আদমজীর মত পাটকল বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে। কিন্তু কেন লোকসান এবং তা উত্তরণের কোন উপায় ছিল কিনা, নাকি কেবল ব্যক্তিপুঁজির বিকাশ ঘটানোর জন্য আদমজী বন্ধ করা হয়েছে?

কিছু বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্তারা সেবার নামে অত্যন্ত সুকৌশলে ব্যবসায়িক স্বার্থ চরিতার্থ করে চলেছে। গায়ে সেবাব্রতের চাদর জড়িয়ে ব্যবসায়ই তাদের কাছে মূখ্য হয়ে উঠেছে। যার ফলে কৃষকের হাজার বছর ধরে যে বীজ সংরক্ষণের ঐতিহ্য ছিল তা আজ বহুজাতিক কোম্পানীর হাতে চলে গেছে।

এরকম বিষয়গুলো সম্পর্কে জনগণ একেবারেই অন্ধকারে। এমনিভাবে তথ্য গোপন করে একশ্রেণীর মানুষ ফুলে ফেঁপে উঠছে আর বৃহত্তর জনগোষ্ঠী বঞ্চিত হচ্ছে তার অধিকার থেকে। গোটা জাতি দুর্নীতিতে শীর্ষস্থানের কালিমা বহন করছে। একের পর এক জন্ম নিচ্ছে মাগুরছড়া, ফুলবাড়ি পরিস্থিতি। দেশের সম্পদ তুলে দেয়া হচ্ছে নাইকো, এশিয়া এনার্জির মত বহুজাতিক কোম্পানীর হাতে। কতিপয় আমলা-মন্ত্রী দামীদামী গাড়ি চড়ছে, বিদেশে সম্পদের পাহাড় জমাচ্ছে। কে যে কোথায় বসে মাল্টিন্যাশনালদের সঙ্গে কি চুক্তি করছে তার হদিস মিলছে না।

পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তাসহ যে সকল সেবা সরকারি, আধাসরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত সেবা প্রতিষ্ঠান থেকে জনগণের পাবার কথা, তা তারা পাচ্ছে না। বরং ঐ সকল সেবা প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী জনগণকে প্রতিনিয়ত হয়রানি ও অপদস্থ করে চলছে নানা অজুহাতে। জনগণের কাছে তাদের কোন ধরনের জবাবদিহিতা নেই।

সরকারী প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকান্ডের তথ্যও জনগণের কাছে সুস্পষ্ট থাকা জরুরী। কারণ বলা হয়ে থাকে বেসরকারী সংস্থাসমূহ দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রায় সব বেসরকারী সংস্থাই পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠির ভাগ্য পরিবর্তনে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়ে সরকারী অর্থ কিংবা বিদেশী অনুদান ব্যবহার করছে। অর্থনীতিবিদদের

তথ্যানুযায়ী এ সকল অর্থের ২৫ ভাগও যদি উন্নয়ন কর্মকান্ডে ব্যবহৃত হত তাহলে দেশের উন্নয়ন আরো বেশি তরান্বিত হত। কেন তা হচ্ছে না?

যে আইন প্রণীত ও গৃহীত হলে জনগণের ক্ষমতায়ন ঘটে, তাদের অধিকার বাড়ে সেরকম আইন সহজে প্রণীত হয় না। তার জন্য প্রয়োজন অব্যাহত চাপ প্রয়োগের। সেরকম পথেই জনগণের তথ্য অধিকার আইন প্রণীত হবে।

গোপনীয়তার সংস্কৃতির কারণে এবং অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত না থাকায় একদিকে মানুষ যেমন জানতে পারছে না রাষ্ট্রীয় সেবা পেতে হলে তাকে কী করতে হবে, কোথায় গেলে তার ওপর সংগঠিত অন্যায়-অবিচার বা প্রহসনের বিচার পাবে বা আইনগত সহায়তা পাবে। ঠিক তেমনিভাবে কিছু বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্তারা সেবার নামে অত্যন্ত সুকৌশলে ব্যবসায়িক স্বার্থ চরিতার্থ করে চলেছে। গায়ে সেবাব্রতের চাদর জড়িয়ে ব্যবসায়ই তাদের কাছে মূখ্য হয়ে উঠেছে। যার ফলে কৃষকের হাজার বছর ধরে যে বীজ সংরক্ষণের ঐতিহ্য ছিল তা আজ বহুজাতিক কোম্পানীর হাতে চলে গেছে।

তথ্যের অধিকার নিশ্চিত হলে গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা পাবে এবং দুর্নীতি হ্রাস পাবে। সুতরাং জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করতে আইন প্রণয়ন এর বিষয়টি অত্যন্ত জরুরী। পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকাসহ বিশ্বের অনেক দেশেই ইতোমধ্যে তথ্য অধিকার আইন প্রণীত হয়েছে। আন্তর্জাতিকভাবেও বিভিন্ন সনদ রয়েছে। যেমন আছে ১৯৪৮ সালের মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষনাপত্র। যার ১৯ অনুচ্ছেদ মতে, প্রত্যেকেরই মতামত পোষন করা ও প্রকাশ করার অধিকার রয়েছে। বিনা হস্তক্ষেপে মতামত পোষণ করা এবং যে কোন উপায়ে রাষ্ট্রীয় সীমানা নির্বিশেষে তথ্য ও মতামত সন্ধান করা, গ্রহণ করা ও জানবার স্বাধীনতা এই অধিকারের অন্তর্ভূক্ত।

এছাড়াও রয়েছে ১৯৬৬ সালের 'নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি'। যার ১৯(২) অনুচ্ছেদ অনুসারে, "প্রত্যেকেরই অধিকার আছে মতামত প্রকাশ করার; রাষ্ট্রীয় সীমানা নির্বিশেষে মৌখিক, লিখিত অথবা শিল্প

মাধ্যম কিংবা পছন্দ মতো অন্য যে কোন মাধ্যম হতে সকল ধরনের তথ্য ও মতামত অনুসন্ধান করা, গ্রহণ করা ও জানবার স্বাধীনতা এই অধিকারের অন্তর্ভূক্ত"। ইতোমধ্যে এই চুক্তিটি ২০০০ সালের ৬ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ অনুসমর্থন করেছে। অথচ তার কোন প্রতিফলন আমাদের দেশে নেই।

বাংলাদেশ আইন কমিশন নাগরিকদের তথ্য অধিকার সুরক্ষার জন্য ২০০২ সালে **'তথ্য অধিকার আইন ২০০২'** নামে একটি খসড়া আইন প্রস্তাব করেছে। কিন্তু আজও তা নিয়ে জনগণের সাথে কোন ধরনের আলাপ আলোচনা নেই। জনগনের জন্য প্রণীত হবে আইন অথচ জনগণের তার সাথে কোন যোগসূত্র নেই। উপরন্তু তা ফাইল চাপা অবস্থায় পড়ে আছে। জনগণের মতামতের ভিত্তিতে প্রস্তাবিত আইনটি স্পষ্ট ও গ্রহণযোগ্য করে দ্রুত প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

কিন্তু যে আইন প্রণীত ও গৃহীত হলে জনগণের ক্ষমতায়ন ঘটে, তাদের অধিকার বাড়ে সেরকম আইন সহজে প্রণীত হয় না। তার জন্য প্রয়োজন অব্যাহত চাপ প্রয়োগের। সেরকম পথেই জনগণের তথ্য অধিকার আইন প্রণীত হবে। আবার এটাও মনে রাখা দরকার কেবল আইন প্রণীত হলেই তথ্যের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে না। প্রয়োজন হবে তার বাস্তবায়ণে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং স্বত:স্ফূর্ত ও সক্রিয় অংশগ্রহণ।

লেখক : নাগরিক উদ্যোগ-এর কর্মরত।

Management and Resources Development Initiative
2/9, Sir Syed Road
(3rd Floor)
Mohammadpur
Dhaka-1207
* MRDI *

সচিবালয়: নাগরিক উদ্যোগ, বাড়ি নং ৮/১৪, ব্লক-বি, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭